স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ১৬ সংখ্যা।। ১০ ডিসেম্বর - ২০১২।। ২৪ অগ্রহায়ণ - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

সীমান্ত প্রগ্রাম

'দেশের রক্ষা আমাদের ধর্ম,
দেশের সেবা আমাদের কর্ম'

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫
সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৭
পশ্চিমবঙ্গে কি অঘোষিত সেনশরশিপ চালু হচ্ছে □ ৯
কোথায় সে শিশু যে বলবে ‘রাজা তুমি উলঙ্গ’ □ ১০
খোলা চিঠি : মাস্টারমশাই আপনি কিছুই দেখেননি! □ সুন্দর মৌলিক □ ১১
মানবেন্দ্রনাথ রায়-এর নয়া মানবতাবাদ দর্শন □ অধ্যাপক আশিস রায় □ ১২
সীমান্ত প্রণাম : এক অভিনব কার্যক্রম □ ১৪
উত্তরবঙ্গে ‘সরহদ কো প্রণাম’ □ জয়রাম মণ্ডল □ ১৫
সীমান্তের অসহায় মুখগুলি আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে □ সুভাষ নন্দী □ ১৭
কেন জপ করবেন, কিভাবে করবেন □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২১
পৌরাণিক নগর উশীনর □ গোপাল চক্রবর্তী □ ২২
দাঁতনে মোঘলমারি গ্রামে বুদ্ধ-বিহার □ ভোলানাথ নন্দী □ ২৩
খুচরো ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ পুঁজি নিয়ে ভোট নয় কেন? □ অরুণ জেটলি □ ২৮
আমার সেই সোনার বাংলা কই, আমি যে তাকে বড় ভালোবাসি □ অসিতবরণ ঠাকুর □ ৩০
মহিলাদের সুরক্ষায় ‘বীরাঙ্গনা বাহিনী’ গড়ছে অসম পুলিশ □ বিরাজ রায় □ ৩৩

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ □ □ ভাবনা-চিন্তা : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □
অঙ্গনা : ২৬ □ □ অন্যরকম : ২৭ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৫
□ □ রঙ্গম : ৩৯ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১ □ □ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

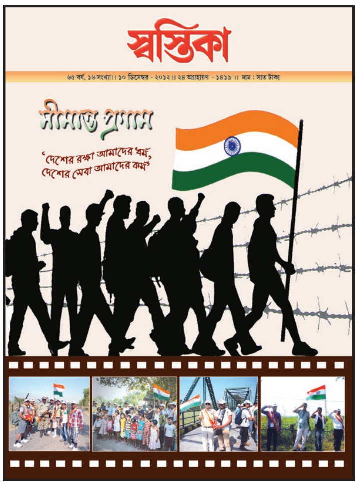

‘সীমান্ত প্রণাম’ পৃঃ ১৪-১৮

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য
সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য
প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ১৬ সংখ্যা, ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১৪, ১০ ডিসেম্বর - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার বিশেষ বিষয় :

প্রচ্ছদ : কতটা সুরক্ষিত জাতীয় নিরাপত্তা ?

প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে এই প্রশ্নটা বারবার ঘুরে-ফিরে আসে, 'আদৌ সুরক্ষিত তো আমাদের দেশের নিরাপত্তা।' আগামী প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালেও এই প্রশ্নের ব্যত্যয় হচ্ছে না। কিন্তু একি কেবল একদিনের ভাবনা? বাকি ৩৬৪ দিন কি এনিয়ে উদাসীন-ই থাকবো? চীন-পাকিস্তান দু'দিক দিয়ে ভারতের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলার পরও? উত্তর খুঁজছে স্বস্তিকা। লিখেছেন — **মেজর জেনারেল কে কে গঙ্গোপাধ্যায় (অবসপ্রাপ্ত), তরুণ শাণ্ডিল্য প্রমুখ।**

থাকছে অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ও।

।। দাম একই থাকছে — সাত টাকা।।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

মুসলিম বধূ

গুরুনানকের জন্মদিনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী এক অনন্য বার্তা রাজ্যবাসীকে উপহার দিয়াছেন। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের এক মঞ্চে তিনি বলিয়াছেন, 'আমার পরিবারে শিখ সম্প্রদায়ের বধূ রহিয়াছে। আমি চাই মুসলিম পরিবারভুক্ত একটি কন্যা আমার পরিবারের বধূ হইয়া আসুক।' এই বার্তাটিতে তাঁহার নিজের পরিবারের মনোভাব ব্যক্ত হইলেও পরোক্ষভাবে রাজ্যবাসীকে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় মুসলিম ধর্মগুরুরা আপাতত নিশ্চুপ রহিলেও শিক্ষিত মুসলিম মহিলারা সাধুবাদ জানাইয়াছেন এবং বোধহয় মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তাঁহাদের সমাজের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও কুসংস্কারের বেড়াজাল অক্টোপাশের মতো মহিলাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছে। মুসলিম সমাজে মহিলারা ভোগের সামগ্রীমাত্র। ইন্টারনেটের যুগেও মুসলিম সমাজে বাল্যবিবাহ রোধ করা যায় নাই। মুসলিমপ্রধান গাঁ-গঞ্জে যাইলেই চোখে পড়িবে নাবালিকা বধূদের। এইসব বালিকা ও কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক ও বৌদ্ধিক গঠন— কোনওটাই পরিণত নহে। মেয়েদের অপরিপক্কতার সুযোগ লইয়াই তাহাদের প্রতারিত করা হইতেছে। হিন্দু সমাজে এইরূপ বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রামমোহন, বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা শুরুতে বাধা-বিঘ্নের সম্মুখীন হইলেও পরবর্তী সময়ে সমাজে গৃহীত ও প্রচলিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে মুসলিম সমাজে যাঁহারা এইরকম চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের কপালে কি জুটিয়াছিল ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। পণপ্রথা এখনও বর্তমান। শত দারিদ্র্যের মাঝেও পণ-দেনমোহর ছাড়া বিবাহের কথা মুসলিম বাবা-মায়েরা ভাবিতেই পারেন না। মুসলিম সমাজে এখনও কথায় কথায় তালাক দিয়া বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়া যায়। মুসলিম পুরুষ মনে করেন স্ত্রীকে শাসন করিবার সমস্ত অধিকার তাঁহার রহিয়াছে। মুসলিম সমাজে মহিলাদের স্বাধীনতা ও অধিকার পুরোপুরিভাবে পুরুষের ইচ্ছা নির্ভর। স্বামী একাধিক বিবাহ করিলেও স্ত্রীর তাহা লইয়া প্রতিবাদ করিবার কোনও অধিকার নাই কারণ ধর্মীয় এবং সামাজিক বিধান এ বিষয়ে মূক। মুসলিম পুরুষ মনে করিয়া থাকে স্ত্রী হইতেছে তাহার যথেচ্ছ ভোগের সামগ্রী। মুসলিম সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ প্রথাগত শিক্ষায় (মাদ্রাসায়) শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। তাই মেয়েদের শিক্ষার জন্য কোনও মাথাব্যাথা নাই। বেশিরভাগ বাবা-মাও মেয়েকে শিক্ষিত করিতে চাহে না। মুসলিম মহিলারা শিক্ষিত হইলে রক্ষণশীলতার বেড়া ভাঙিয়া যাইবে, সমাজ গোল্লায় যাইবে, মোল্লাতন্ত্রের এইরূপ অপপ্রচারেই মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হয় না। এইরকম নানা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার হইতে এই সমাজ এখনও মুক্ত হইতে পারে নাই। যৌন রোগাক্রান্ত কোনও মহিলাকে ডাক্তারের কাছে না লইয়া গিয়া এখনও পাপী বলিয়া বদ্ধঘরে ফেলিয়া রাখা হয়। পুরুষরা স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব স্বীকার করিতে নারাজ। মুসলিম সমাজে পুরুষ নির্ভরতাবিহীন কোনও একক নারীর অস্তিত্ব প্রায় অসম্ভব। আজও মুসলিম সমাজে 'নারী' শব্দের অর্থ হইতেছে অবগুণ্ঠন, লাঞ্ছনা, পুরুষ পিতা ও স্বামীর অনুগৃহীত জীব। অপরদিকে বর্তমানে হিন্দু সমাজ অনেকাংশে এইসব ত্রুটিমুক্ত। হিন্দু সমাজ নারীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। হিন্দু সমাজে নারী পুরুষের সমান অধিকার সাধারণ ভাবে মান্যতা পাইয়াছে। নারীর-সম্মান, মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব হিন্দু সমাজ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে। আজ হইতে মাত্র ৭০/৮০ বৎসর পূর্বের ধ্যান-ধারণা ক্রমবিকাশের ধারা অবলম্বন করিয়া ক্রমশ বিকশিত হইয়া এক সুসংগঠিত, সুবিন্যস্ত সমাজ নির্মাণে ব্রতী হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই এই প্রক্রিয়া এবং পরিণত শিক্ষা আলোকপ্রাপ্ত মুসলমান সমাজের নতুন প্রজন্মের মহিলাদের অগোচরে নাই। তাই আজ সংখ্যায় অত্যল্প হইলেও মুসলমান নারী হিন্দু পতি গ্রহণ করিতেছেন। হিন্দু জীবনের উৎকর্ষতাকে অনুধাবন করিয়া হিন্দুত্বের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছেন। এক কথায় ইহাকে উত্তরণ বলিলে অতিশয়োক্তি হইবে না।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

গীতায় কি উক্ত হয় নাই—'স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ'?—এই ধর্মের অল্পমাত্রও আমাদিগকে মহৎ ভয় হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব তুমি স্ত্রী হও বা শূদ্রই হও বা আর যাহা কিছু হও—তোমার কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই, যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, এই ধর্ম এতই বড় যে, ইহার অতি অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও মহৎ কল্যাণ হইয়া থাকে। অতএব হে আর্যসন্তানগণ, অলসভাবে বসিয়া থাকিও না—ওঠ, জাগো, যতদিন না সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সংবাদ প্রতিবেদন

বিজেপির উত্থান সমাবেশে দাবী : রাজ্যে বিজেপির জনভিত্তি বাড়ছে

ভোলানাথ ভাদুড়ী॥ চৌত্রিশ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে পশ্চিমবঙ্গবাসী যাদের ক্ষমতায় এনেছে, এক বছরের মধ্যেই সাধারণ মানুষ তাদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে নতুন ভাবনা ভাবতে শুরু করেছে বলে দাবি করলেন বিজেপি রাজ্য-সভাপতি রাহুল সিনহা। গত ৩০ নভেম্বর কলকাতা রাণী রাসমণি রোডে অনুষ্ঠিত দলীয় সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, গত এক বছরের মধ্যে বিজেপির সদস্য সংখ্যা একদিকে যেমন দ্বিগুণের বেশী হয়েছে, অন্যদিকে শাসক দলের তৃণমূল কর্মীরাও দলের এবং সরকারের কাজকর্মের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছে।

উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরেই ৩০ নভেম্বর দিনটিকে বিশেষভাবে পালন করে আসছে রাজ্য বিজেপি। এ প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতির বক্তব্য—২০০৭ সালে বিজেপি একক ক্ষমতায় রাজ্যে বনধ্ ডেকে সফল করেছিল। এরপর মহাকরণ অভিযোগ তথা ঘেরাও এবং পরবর্তী বছরে সর্বভারতীয় সভাপতির উপস্থিতিতে বিশাল জনসভা ইত্যাদি হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই ২০০৭-কে বিজেপি উত্থান দিবস হিসাবে পালন করছে। এবারের সমাবেশে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলি থেকে এসেছে বলে দলীয় সূত্রে দাবি করা হয়। অনুরূপ সভা উত্তরবঙ্গেও করা হবে বলে তিনি জানান।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে রাজ্যসভার সাংসদ চন্দন মিত্র বলেন, রাজ্যজুড়ে যে বিজেপির সমর্থন বাড়ছে এবং মানুষ বিজেপিকেই বিকল্প ভাবছে তার প্রমাণ আজকের সমাবেশের উপস্থিতি এবং কিছুদিন আগের জঙ্গিপুর লোকসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপির জনসমর্থন বৃদ্ধি। প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথাগত রায় বলেন, বেকার সমস্যা এবং কৃষকদের তথা কৃষির উন্নতি বিজেপিই করতে পারে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলো তার প্রমাণ। সাধারণ মানুষও আজ একথা বলতে শুরু করেছে যে, বাজপেয়ী সরকারই ছিল সাধারণের স্বার্থের প্রতি দায়বদ্ধ, এরাই পারবে। দিল্লীতে যারা পেরেছে তারাই গুজরাট মধ্যপ্রদেশে পারছে, বাংলাতেও তারাই পারবে। এছাড়া সভায় ভাষণ দেন প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তপন সিকদার, অসীম ঘোষ এবং বিশ্বপ্রিয় রায়চৌধুরী প্রমুখ।

মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ কাণ্ডে প্রধান অভিযুক্তদের জামিন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ কাণ্ডে 'হিন্দু সন্ত্রাসবাদ'-এর তকমা লাগিয়ে যে দু'জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেই দেবেন্দ্র গুপ্ত ও লোকেশ শর্মাকে হায়দরাবাদ আদালত জামিন দিয়েছে। যদিও স্বামী অসীমানন্দের এখনও জামিন হয়নি। আদালতের এই নির্দেশ ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সী (এন আই এ)-র কাছে এক বড় ধাক্কা। গত ২৭ নভেম্বর আদালত এই 'বেল অর্ডার' দেয়। ২০০৭ সালে মক্কা মসজিদ বিস্ফোরণ কাণ্ডে এই দু'জনকে প্রধান অভিযুক্ত বলে এন আই এ সাব্যস্ত করে। শুধু তাই নয়, এই দুজনকে সমঝোতা এক্সপ্রেস ও আজমেঢ় দরগা বিস্ফোরণ কাণ্ডে জড়িত বলে অভিযোগ দায়ের করে এন আই এ। অভিযুক্তরা আর এস এসের প্রাক্তন স্বয়ংসেবক বলে এন আই এ-র অভিযোগ। এই দুজনকে প্রথমে রাজস্থান পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরে ২০১০ সালে সিবিআই হিন্দু সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে এরা যুক্ত বলে অভিযোগ জানায়। এই মামলাটির তদন্ত করছে এন আই এ-র হায়দরাবাদ শাখা।

এই দুজনের উকিল বেণুগোপাল জানিয়েছেন, আদালত এই দুজনকে তাদের পাসপোর্ট জমা দিতে বলেছেন এবং প্রত্যেককে ৫০,০০০ টাকা হিসাবে জামিন করেছেন। বেণুগোপাল আরও জানিয়েছেন যে তারা যাতে শীঘ্রই সমঝোতা ও আজমেঢ় মামলাতেও জামিন পায় তার জন্য আবেদন জানাবেন। এন আই এ ২০১১ সালে সি বি আই-এর কাছ থেকে এই মামলা নিজেদের হাতে নেয়। কিন্তু অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়। এন আই এ-র ডিজি-র সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আদালতের আদেশটিকে খতিয়ে দেখা হবে এবং যদি প্রয়োজন হয় তবে 'বেল অর্ডার'-এর বিরুদ্ধে আবেদন করা হবে। উল্লেখ্য, দেবেন্দ্র গুপ্ত ও লোকেশ শর্মা সমঝোতা ও আজমেঢ় বিস্ফোরণ মামলাতেও অভিযুক্ত হওয়ায় এখন জেলেই রয়েছেন।

সীমা-সমস্যা মেটাতে স্পষ্ট হচ্ছে চীনের অনীহা

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারত-চীন দু'পক্ষের প্রতিনিধিদলের ১৫ দফা বৈঠকের পরেও সীমা সংক্রান্ত বিষয়ে যুগ্ম স্ট্যাটাস রিপোর্টে সম্ভব হলো না ঐক্যমত্যে পৌঁছন। প্রসঙ্গত, রাজনৈতিক মাপকাঠির ভিত্তিতে এবং সীমা প্রশ্নে সহমতে পৌঁছতে যে নীতি নির্ধারিত হয়েছিল, এখন

জিনপিং

লি

পর্যন্ত তাই-ই রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তিন দফার পদক্ষেপ। তবে তথ্যাভিজ্ঞ মহল মনে করছেন, সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ- পরিস্থিতির ওপর বৈঠকে চীনের মনোভাবের গতিপথ পরিবর্তিত হয়। গত ১৫ দফায় চীনের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে দাই বিংওয়ো ভারতের সঙ্গে কথাবার্তা চালান। এখন শোনা যাচ্ছে, তিনি এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে চাইছেন। অনুমান তাঁর পরিবর্তে চীনের বিদেশমন্ত্রী ইয়াং যেইচি 'স্টেট কাউন্সিলার' হিসেবে নির্বাচিত হতে পারেন এবং এই কাজের দায়িত্বভারও নিতে পারেন। অথচ বেজিং থেকে এব্যাপারে ভারতের কাছে এখনও কোনও বার্তাই আসেনি। তাই সীমা সমস্যা সমাধানে চীনের সদিচ্ছা যে বরাবরের মতো এবারও বিতর্ক এড়াতে পারছে না তা স্পষ্ট। অন্যদিকে চীনের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন ভারতের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের পরামর্শদাতা শিবশঙ্কর মেনন।

তিনি আশা করছেন, দাই-এর ব্যাপারে চীনের কাছ থেকে চলতি সপ্তাহেই কোনও সদর্থক বার্তা পাওয়া যাবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন ভারত ও চীনের দু'পক্ষের মধ্যস্থতাকারীরা তাঁদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রতিনিধি হিসেবে যেভাবে উভয়ের মনোভাবকে তুলে ধরতে সমর্থ হচ্ছিলেন, চীনের প্রতিনিধি বদলের সিদ্ধান্তে তা ব্যাহত হবার সমূহ সম্ভাবনা। দাই ও মেনন ইতিপূর্বে সহমত পোষণ করেছিলেন যে, নয়া চীনা নেতৃত্বের উচিত মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। প্রসঙ্গত, চীন সম্প্রতি বেশ কিছুদিন ধরে অরুণাচল প্রদেশের ৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা তাদের বলে দাবি জানিয়ে আসছে। ইতিপূর্বে আরও অনেক বেশি জায়গা তাদের ছিল বলে দাবি করা হচ্ছিল। এখন তাওয়াং সহ অরুণাচলের বড় একটি অংশ তাদের বলে দাবি করে চোরাগোপ্তা হামলাও চালায় চীন। ভারতের কূটনৈতিক মহল মনে করছেন, তাদের দাবি যে ভীষণরকমই অন্যায্য বুঝতে পেরে নানা ছল-চাতুরীর সাহায্যে ভারতকে কূটনৈতিক দিক দিয়ে কোণঠাসা করতে চাইছে চীন। যে কারণে বারবার মুখোমুখি বৈঠকে রক্ষাসূত্র এড়াতে নানা কূট-কৌশলের আশ্রয় নিচ্ছে তারা। ভারত-চীন বিশেষ প্রতিনিধিদলের গত ১৫ দফা বৈঠক ভেস্তে যাওয়া চীনের সেই কৌশলের অঙ্গ বলে অভিমত সমর বিশেষজ্ঞদের।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

স্বস্তিকা

পড়ুন ও পড়ান

প্রতি সংখ্যা : ৭.০০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য : ৩২৫.০০ টাকা

SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY
RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH
SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155
CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

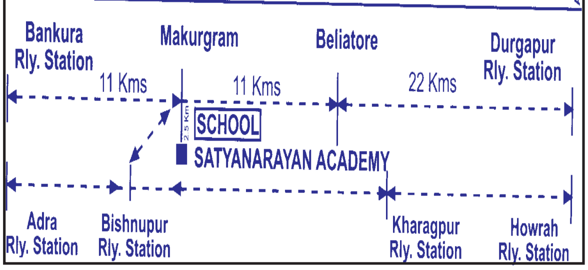

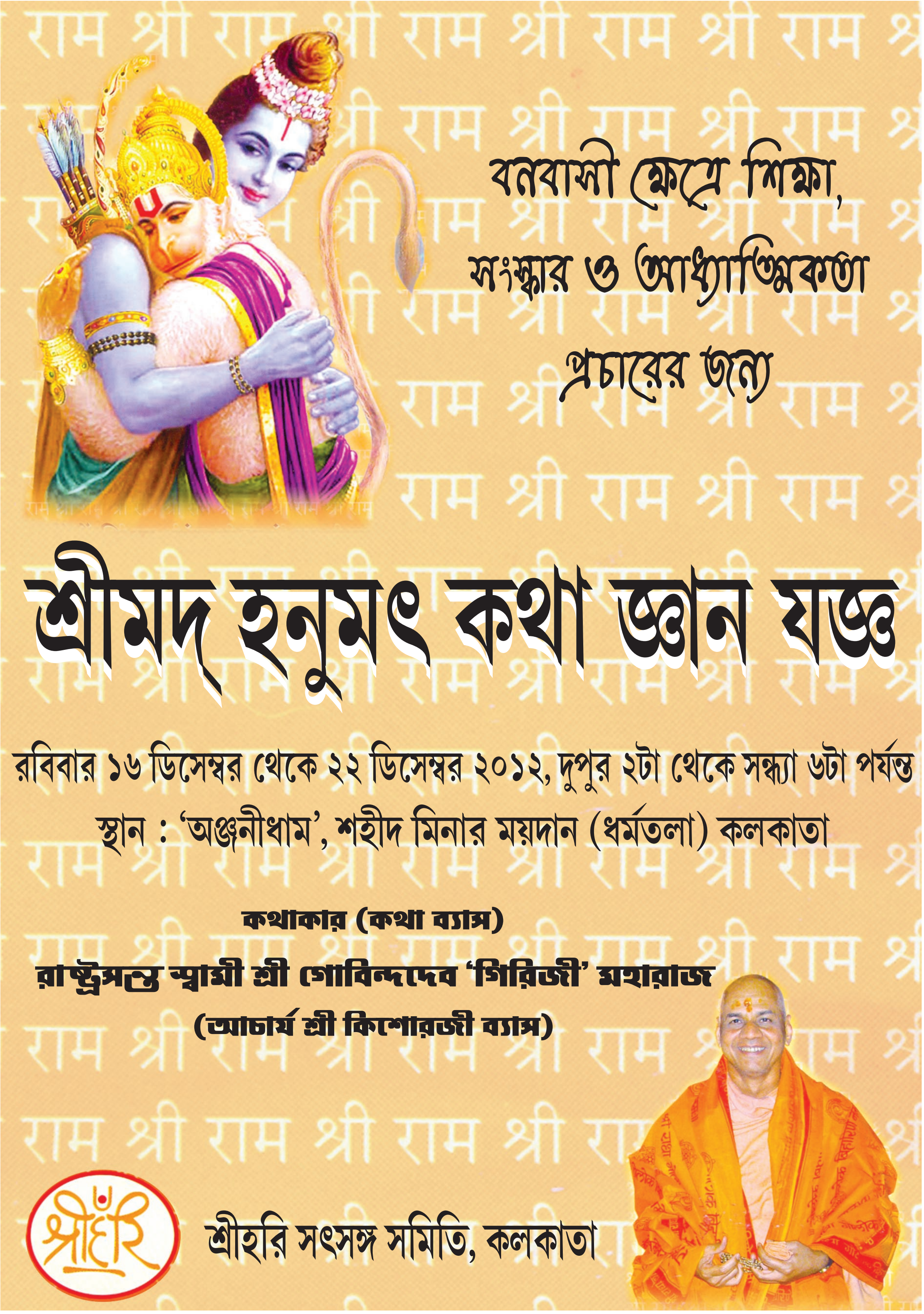
বনবাসী ক্ষেত্রে শিক্ষা,
সংস্কার ও আধ্যাত্মিকতা
প্রচারের জন্য
শ্রীমদ্ হনুমৎ কথা জ্ঞান যজ্ঞ
রবিবার ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর ২০১২, দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত
স্থান : 'অঞ্জনীধাম', শহীদ মিনার ময়দান (ধর্মতলা) কলকাতা
কথাকার (কথা ব্যাস)
রাষ্ট্রসন্ত স্বামী শ্রী গোবিন্দদেব 'গিরিজী' মহারাজ
(আচার্য শ্রী কিশোরজী ব্যাস)
শ্রীহরি সৎসঙ্গ সমিতি, কলকাতা

গূঢ়পুরুষের কলম

পশ্চিমবঙ্গে কি অঘোষিত সেনসারশিপ চালু হচ্ছে?

সংবাদমাধ্যম এবং সাংবাদিকরা হুঁশিয়ার। তৃণমূল নেত্রীর চোখের বালি এখন তাবৎ সাংবাদিককুল। বিশেষত বাংলা খবরে কাগজ এবং টিভি সংবাদ চ্যানেলের সাংবাদিকরা। তাঁরাই নাকি নেত্রীকে এবং তাঁর ঘাসফুল পার্টিকে ডোবাচ্ছেন। দলের মধ্যে ভাঙন এনে দিয়েছেন। তাই আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই সাংবাদিকদের শায়েস্তা করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই কারা ভাল সাংবাদিক আর কারা মন্দ সাংবাদিক তা' চিহ্নিত করা হয়েছে। ভাল সাংবাদিক মানে যাঁরা নেত্রীর দলের ফলটা, দুধটা, ক্ষীরটা 'প্রসাদ' পান। আর মন্দ সাংবাদিক মানে যাঁরা নেত্রীর এবং তাঁর দলের ভুলভ্রান্তি, ত্রিফলা আলো নিয়ে দুর্নীতি ইত্যাদি অপকর্মের স্পষ্ট সমালোচনা করেন। কলকাতায় সরকারি প্রেসকার্ড আছে এমন সাংবাদিকদের সংখ্যা চারশোর বেশি। এর মধ্যে ঘাসফুল পার্টির পছন্দের সাংবাদিক আছেন ২৪ জন। এই ভাল বা পছন্দের সাংবাদিকরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন কমিটির সদস্য। এই ভাল সাংবাদিকদের মধ্যে আবার যাঁরা 'অতি সুবোধ' তাঁদের জন্য বিশেষ পদ তৈরি করে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে। এই 'সুবোধ' সাংবাদিকরা নিয়মিত মাসে মাসে সরকারি ভাতা পান। মহাকরণের চারতলায় তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরে এঁরাই এখন সর্বেসর্বা। দফতরের আমলারা 'সুবোধ' সাংবাদিকদের দাপটে সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকেন। তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের মহিলা সচিব মহাশয়াতো ঘোষণাই করে দিয়েছেন, তিনি যতদিন তাঁর পদে আছেন ততদিন মহাকরণে তাঁর অফিস ঘরে সাংবাদিকদের প্রবেশ নিষেধ। তবে কলকাতার বাংলাভাষী জনৈক সাংসদ-সাংবাদিকের জন্য তাঁর দরজা সর্বদাই খোলা। বাদবাকি সকলেই অচ্ছুৎ। এর একটা কারণ হতে পারে, সাংসদ-সাংবাদিক মহাশয় নেত্রীর এতটাই কাছের লোক যে তাঁর একটি ফোনে সচিব মহাশয়া 'কম্পালসারি ওয়েটিং লিস্টে' চলে যাবেন। মহাকরণে বসার জন্য একটা টুলও পাবেন না।

ঘাসফুল পার্টির চিহ্নিত 'সুবোধ' ও 'অতি সুবোধ' সাংবাদিকরাও যে বিশেষ স্বস্তিতে আছেন তা নয়। তাঁরাও অনেক সময় বুঝে উঠতে পারছেন না ঠিক কী করলে নেত্রী খুশি হবেন। উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজেই বোঝা যাবে। গত বিধানসভার নির্বাচনের মুখে বামফ্রন্ট সরকার ঘোষণা করে যে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ও অসুস্থ সাংবাদিকদের কল্যাণে মাসিক দু'হাজার টাকা ভাতা দেবেন। এই ধরনের ভাতা রাজ্যের প্রাক্তন সমাজসেবী, লেখক, শিল্পীরা পেয়ে থাকেন। রাজ্যের প্রবীণ, অসুস্থ এবং কোনওরকম সূত্র থেকে আয় নেই এমন অবসরপ্রাপ্ত সাংবাদিকদের অনেকেই সরকারি ভাতার জন্য আবেদন জানান। এরপর ঘটা করে কলকাতা প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠান করে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্তমশাই জনৈক প্রবীণ সাংবাদিকের হাতে পেনসনের অর্ডারের সরকারি কাগজপত্র তুলে দেন। অসীমবাবু জানিয়ে দেন অন্যান্য আবেদনকারী প্রবীণ সাংবাদিকের পেনসনের টাকা তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সাতদিনের মধ্যেই জমা পড়ে যাবে। বাস্তবে রাজ্যের একজন সাংবাদিকও বামফ্রন্টের আমলে প্রস্তাবিত পেনসন পাননি। কারণ, এই খাতে কোনও অর্থ বরাদ্দের মঞ্জুরী ছিল না।

সেই সময় নেত্রী বলেছিলেন, এটা বামফ্রন্টের অর্থমন্ত্রীর প্রকাণ্ড ধাপ্পা। আলিমুদ্দিনের নির্দেশেই প্রতারণার ফাঁদ পেতে ছিলেন অসীমবাবু। নেত্রী স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায় এলে এই অন্যায়ের প্রতিকার করবেন। তাঁর মন্ত্রীসভা সিদ্ধান্তও নেয় যে অবসরপ্রাপ্ত প্রবীণ, আয়শূন্য সাংবাদিকদের ঘাসফুলের সরকার মাসিক আড়াই হাজার টাকা পেনসন দেবে। গত ১৭ মে সরকারি অর্ডারও বেরোয়। তারপরেই নেত্রীর হঠাৎ ধারণা হয় কলকাতার সাংবাদিকরা সিপিএম দলের এজেন্ট। তাঁরা নেত্রীর সরকারের এবং দলের জনদরদী ভাবমূর্তির ক্ষতি করছেন। তাই পেনসন অর্ডারটির ফাইলে লাল ফিতা কড়া করে বেঁধে দেওয়া হলো। কয়েকজন নেত্রীকে বোঝাবার চেষ্টাও করেছিলেন, এইসব বৃদ্ধ ও অতিবৃদ্ধ সাংবাদিকরা এখন লেখালেখি বা চ্যানেলে বলাবলি করেন না। তাঁরা নেত্রীর বিরোধী নন। নেত্রীর সাফ জবাব, এই বুড়ো হাবড়া ঘাটের মড়া সাংবাদিকদের সাহায্য করার কথা পরে মানে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এলে ভাবা যাবে। এখন প্রধান কাজ, অবাধ্য, অবোধ সাংবাদিকদের শায়েস্তা করা। হ্যাঁ, ঠিক এই কথাটাই নব নিযুক্ত কৃষি প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না ২ ডিসেম্বর সিঙ্গুরে বলেছেন। বেচারাম বলেছেন, 'অবাধ্য সাংবাদিকদের গ্রামে ঢুকতে দেবেন না। এরা ঘাসফুল পার্টির বদনাম করে।' তবে যাঁরা 'সুবোধ' সাংবাদিক তাঁদের বেচারামের গ্রামের লোকজন চিনবে কীভাবে? সহজ উত্তর। সুবোধ সাংবাদিকরা পঞ্চায়েত নির্বাচনের খোঁজ খবর করতে আসার আগে দলের কলকাতার নেতারা আগেভাগে জানিয়ে দেবেন। হয়তো তা 'সুবোধ' বাবুদের পকেটে ঘাসফুলের পরিচয়পত্রও থাকবে। সব দেখেশুনে মনে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে অঘোষিত প্রেস সেনসারশিপ চলছে। মহাকরণে সাংবাদিকদের চলাফেরা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। সাংবাদিকদের নাম পরিচয় ইত্যাদি লিখে প্রতিদিন মহাকরণে প্রবেশ করতে হয়। এতটা বাড়াবাড়ি করতে বামফ্রন্ট সরকারও সাহস করেনি।

কোথায় সে শিশু যে বলবে "রাজা তুমি উলঙ্গ"

নিশাকর সোম

বিগত তিন দশকের উপর পশ্চিমবঙ্গের একের পর এক মুখ্যমন্ত্রীর কীর্তি রাজ্যকে কলঙ্কিত করে তুলেছে। এই দশকের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু রাজ্যপাট প্রায় দু' দশক চালালেন। কোনও দীর্ঘমেয়াদি বা ক্ষুদ্রমেয়াদি পরিকল্পনা করেননি। শুধু হ্যান্ড টু মাউথ নীতি চালালেন। শিল্পে শিক্ষায় রাজ্যের অধোগতি হলো। আর এই জ্যোতিবাবুর মুখ্যমন্ত্রীত্বে ১৯৯৩-এর ২১ জুলাই পুলিশের গুলি চালনোর ঘটনা ঘটে। এই গুলি চালনার সম্পর্কে তদানীন্তন পুলিশকমিশনার তুষার তালুকদার জানিয়েছেন যে গুলি চালনার আদেশ কে দিয়েছিলেন তা জানা যায়নি।

এর পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য চমক সৃষ্টি করার জন্য শিল্পায়নের নামে সিঙ্গুর-টাটাকোম্পানি নন্দীগ্রামের কাণ্ড করে রাজ্যের মুখ কলঙ্কিত করলেন। শুধু তাই নয়, ৩৪ বছরের বাম-শাসকের সৌধ-কে ধূলিসাৎ করে দিলেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই অত্যাচারী অপশাসনকে দূর করার জন্য অস্থির হয়ে বিরোধী নেত্রীর আন্দোলনকে সমর্থন জানান। এলো লোকসভা নির্বাচন। বামফ্রন্ট ধাক্কা খেলো। তবুও তাদের সম্বিত ফিরলো না। বিধানসভা নির্বাচন হলো, ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল বামফ্রন্ট। ইতিহাসে বুদ্ধবাবুর নাম কলঙ্কিত নায়ক হিসাবে দেখা যাবে।

নতুন মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে এলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জমি ফেরতের প্রতিশ্রুতি থেকে অসম্ভব প্রতিশ্রুতির ফানুস উড়লো। মানুষ উদ্বেল হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যে ছ'বার এ রাজ্যে পুলিশের গুলি চললো। প্রতিবারই মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী পুলিশের গুলিচালনার কথা অস্বীকার করলেন। পার্কস্ট্রীটের নারীর শ্লীলতাহানির ঘটনায় পুলিশ অফিসারের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আগাম বক্তব্য-এর পার্থক্য হওয়ার জন্য পুলিশ অফিসারকে শাস্তিমূলক বদলি করা হলো। ফলে পুলিশ মহলে ত্রাস সৃষ্টি হয়ে গেল। এইসব কাণ্ডকারখানা দেখেশুনে সম্প্রতি প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মার্কণ্ডেয় কার্টুজ বলেছেন, মমতা অসহিষ্ণু মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ভয়ে আমলারা তো বটেই, নিজের দলের মন্ত্রীরা পর্যন্ত নির্ভয়ে কথা বলতে পারেন না। একটা আতঙ্কের

রাজ্য রাজনীতি

পরিবেশ। যদি এইভাবে চলতে থাকে তবে মুখ্যমন্ত্রী বেশিদিন মসনদে থাকতে পারবে না। মহারাষ্ট্রে কার্টুন আঁকার জন্য এক তরুণীকে গ্রেপ্তার করায় পুলিশকর্মীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। এখানেও একই অভিযোগে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অম্বিকেশ মহাপাত্র এবং ঝাড়গ্রামের শিলাদিত্য চৌধুরীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। তাঁদের কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। পুলিশ অফিসার দময়ন্তী সেনের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে তার জন্যও মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে।"

বাগনানে রিভলবার ঠেকিয়ে লুঠপাঠ চালালো বাইকবাহিনী, তোলাবাজের ভয়ে পালাতে গিয়ে মৃত ৪ মানুষ। এ ধরনের ঘটনা বাড়ছেই। পুলিশ নিস্ক্রিয় হতে বাধ্য হয়েছে।

সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগের পরিষেবার নমুনা— পিজি-র শিশুবিভাগে গভীর রাতে আগুন লাগানো। কলকাতা শহরকে লন্ডন বানানোর বাস্তবায়িত করার জন্য মেয়র ত্রিফলা আলোর ব্যবস্থা করলেন। ত্রিফলা আলো বেশি দাম দিয়ে কেনা হচ্ছে মহেশতলার এক কারখানা থেকে। কলকাতা পুরসভার ওয়ার্কসপ কমদামে তা করে দিতে পারা সত্ত্বেও এই কীর্তি হলো। উঠলো দুর্নীতির অভিযোগ। কিন্তু এখন সেই ত্রিফলা-র অর্ডার-এর নথি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মমতা তো বামফ্রন্টের বহু ব্যাপারে সিবিআই-এর তদন্ত চাইতেন। এব্যাপারেও সিবিআই তদন্ত হতে পারে না? এসব সত্ত্বেও সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি মার্কণ্ডেয় কার্টুজ-এর উক্তি সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেন— "রাজা চলে বাজারো কুত্তা ভোঁকে হাজারো।" একথা এর পূর্বেও একই কথা বলেছিলেন। কি সাংঘাতিক কথা! কুত্তা কে? এর সাথে প্রধানমন্ত্রীকে ভাঙানো। মুখ্যমন্ত্রীর কটুক্তির সমর্থনে অতীতে তরমুজ বর্তমানে পঞ্চায়েতমন্ত্রী সুব্রতমুখার্জির বক্তব্য--- কাটুজুর বক্তব্য ফেলে দাও।

নেত্রী খুশিমতো মন্ত্রীসভায় নতুন লোকদের নেওয়াতে পুরাতনদের মধ্যে ক্ষোভ জমছে। অন্যদিকে প্রদেশ কংগ্রেস চিন্তিত— তাদের দল ভাঙার ভয়ে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

মাস্টারমশাই আপনি কিছুই দেখেননি!

রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
মাননীয় পরিসংখ্যান ও প্রকল্প রূপায়ণ মন্ত্রী (এখনও পর্যন্ত)
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই, সেই সিনেমাটা মনে আছে। সেই ‘আতঙ্ক’। সেই গা শিরশির করা ডায়লগ। মনে পড়েছে তো! আমারও মনে পড়ছে। তবে আপনাকে আতঙ্কিত করার জন্য বলছি না। সত্যিই আপনি কিছুই দেখেননি এখনও পর্যন্ত। সত্যিই দেখে উঠতে পারেননি। এক বেচারামকে দেখেই আপনি সব দেখেছেন ভাববেন না। আপনার দলের বাকি ‘কেনারাম-বেচারাম’দের দেখলে জানলে আপনার বিপ্লবী বিবেক আরও অনেক আগেই বিপ্লব করে বসত।

সিঙ্গুরের আন্দোলন না থাকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর মহাকরণ সমার্থক হয়ে উঠত কিনা সে প্রশ্ন আজ অবান্তর। আজ অবান্তর দিদিমনি আদৌ আইন-কানুন জেনে বুঝে সিঙ্গুরের জমি ফিরিয়ে দেওয়ার আন্দোলন করেছিলেন কিনা। ক্ষমতায় এসেই সাত-পাঁচ না ভেবে জমি ফেরানোর গর্বিত ঘোষণা করে ফেলে ঠিক করেছেন কিনা। কিন্তু এটা ঠিক মমতা সিঙ্গুরকে ছাড়তে চাইলেও সিঙ্গুর মমতাকে ছাড়বে না। আপনাকে নিয়ে চলা সুবিধাজনক না হওয়ায় এখন যেমন বেচারামকে তুলে ধরতে হয়েছে, ভবিষ্যতে তেমন কোনও কেনারামকে তুলে ধরতে হবে। ধরতেই হবে। এটা আমি বলে রাখলাম। মিলিয়ে নেবেন।

কারও নাম করে নিজের শত্রু বাড়াতে চাই না। তবে দিদির পাশে পাশে যারা ঘোরেন তাদের থেকে শুরু করে বেচা পর্যন্ত কে কোথায় কত পয়সা তুলছে, কে কোথায় কতখানি দাদাগিরি ফলাচ্ছে, কে কোথায় কেমন করে আখের গোছাচ্ছে দিদি সব জানেন। (আর পাঁচটা বিষয়ে তিনি যেমন সবজান্তা ভাব করেন তেমন নয়। এটা সত্যি সত্যি জানেন।) তিনি এটাও জানেন যে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাবে। জানেন কম্বলের লোম বাছার মতো অবস্থা হবে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসে শুদ্ধিকরণের ধুয়ো তুললে। বরং আমরা শুদ্ধ, আমরা শুদ্ধ স্লোগান তুলে, আমরা ওদের মতো নই বলে চিৎকার করে যাওয়াই ভাল। বুদ্ধিমতি দিদি ঠিক সেটাই করছেন। সেটাই। শুধু কি কলকাতা পুরসভার ত্রিফলার কুফল নাকি, সেই সঙ্গে হলদিয়ার এবিজির হিজিবিজি, বালিতে তপন দত্ত হত্যা রহস্য সবই তো আসলে কাঁটা। সেই কাঁটার বলে গোলাপ হয়ে যেসব বুদ্ধিজীবী সরকারি ভরণপোষণে জীবিকা নির্বাহ করছেন তাদের সাধুত্ব নিয়েও দিদি জানেন না সেটা ভাববেন না। সাধারণ অতি সাধারণ দিদি, কখনই এঁদের নিয়ে ক্ষমতায় আসতে চাননি। হাওয়ার তোড়ে এসে গিয়েছেন। দিদি কী করবেন বলুন তো।

কিন্তু সেই হাওয়া অনুসারে যারা পাল ধরেছিলেন তাদের কিছু কিছু দেওয়াও তো দিদির কর্তব্য নাকি! সেটা না হলে তো লোকে আবার তাঁকে নেমকহারাম বলবে। তবে মাস্টারমশাই আপনার ক্ষেত্রটা আলাদা। আপনার মতো মানুষকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা দেখিয়েই দিদি শিক্ষামন্ত্রীর আসনে বসিয়েছিলেন। তারপর দেখা গেল শিক্ষা জগৎ নিয়ে জীবন কাটানো লোকেদের দিয়ে শিক্ষা নিয়ন্ত্রণ করতে গেলে দলের অনুশাসন খাটে না। পাঠানো হলো আপনাকে চাষের মাঠে। শিক্ষা থেকে কৃষিমন্ত্রী হলেন। কিন্তু চাষের খেতও যে আপনার হাতের তালুর মতো চেনা। সিঙ্গুরের মা-মাটি—মানুষ (সত্যি, সত্যি)-কে নিয়েই তো আপনার জীবন কেটেছে। যাঃ এবারও আপনার হাতে কৃষি ছেড়ে দলীয় নিয়ন্ত্রণ থাকে না যে। তাই মন্ত্রিসভার রদবদল (ভোলবদলও বলা যায়)। কাকে কেন কোন দফতরে নেওয়া হলো বোঝা গেল না। কোন অভিজ্ঞতার জন্য কে কী পেলেন হিসেব মিলবে না। কে কোন দফতর কোন কাজের জন্য হারালেন হিসেব মিলবে না। পরিবহণে কোন সাফল্যের জন্য মন্ত্রীর পদন্নোতি হলো দেবা ন জানন্তি। বরং উল্টো কিছু ঘটলে জনগণের বুঝতে সুবিধা হোত। বিশেষ করে প্রোমোশনের শেষ লগ্নে ভাড়া বাড়িয়ে-কমিয়ে-বাড়িয়ে যে খেলা তিনি দেখালেন। আসলে মাস্টারমশাই, হিসেব মিলবে শুধু রাজনৈতিক দেওয়া-নেওয়ার হিসেব কষলে। আর তাতেই আপনি এখন পরিসংখ্যান ও প্রকল্প রূপায়ণমন্ত্রী।

এই দফতরটার যে ঠিক কী কাজ তা সত্যিই আমার এই বোকা মাথায় আসছে না। এতকাল চন্দ্রনাথ সিংহ ঠিক কী করতেন কে জানে? তবে লোবাগ্রামের প্রকল্প রূপায়ণে তিনি নিশ্চিত ফেল মেরেছেন। আপনি তো নতুন দফতরেই গেলেন না। গেলে সত্যি একদিন বাধ্য ছাত্রের মতো যেতাম দফতরের কাজটা ঠিক কী তা বুঝতে। সবার কাছে তো আর যাওয়া যায় না।

শুরুতেই বলেছি না, মাস্টারমশাই আপনি কিছুই দেখেননি। সত্যিই তো দেখেননি। আপনি যখন শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন তখন কি দেখেছিলেন, আপনার বন্ধুসম রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় কেমন ঈর্ষার চোখে দেখেছিলেন। আসলে তো ওনারই ওই দফতর পাওয়ার কথা। পাননি। তবু দর-দস্তুর করে বিকাশ ভবনের একটা ঘরের দখল নিয়েছিলেন। কারিগরি শিক্ষা। আর তাতেই সাহিত্য পরিষৎ থেকে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে যেখানে তাঁর হাত পৌঁছয় সেখানে সেখানে যতটা মধু পাওয়া যায় আহরণ করেছেন। কিছু মৌমাছির হুলও অবশ্য সহ্য করতে হয়েছে। তাঁকে নিয়ে বলতে বসলে রাত কাবার হয়ে যাবে। আপাতত অবশ্য কারিগরি শিক্ষা নামক ডানাটি ছাটা গিয়াছে। আবার বলছি, মাস্টারমশাই আপনি কিছুই দেখেননি। সব কেনারাম—বেচারামদের নিয়ে আপনাকে চিঠি পাঠালে আপনার সংগ্রহে সুন্দরের পত্রাবলী বেশ মোটাসোটা আকার নেবে। সে না করাই ভালো। বেশি কাদা ঘাটলে আমার আবার অ্যালার্জি হয়। ভালো থাকবেন মাস্টারমশাই।

— সুন্দর মৌলিক

মানবেন্দ্রনাথ রায়-এর নয়া মানবতাবাদ দর্শন

অধ্যাপক আশিস রায়

সমগ্র কর্মজীবন জুড়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের রাজনৈতিক চিন্তা একই ধারায় প্রবাহিত হয়নি। কর্মজীবনের বিভিন্ন স্তরে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের চিন্তায় মৌলিক পরিবর্তন দেখা যায়। কর্মজীবনের গোড়ার দিকে মানবেন্দ্রনাথ রায় ছিলেন জাতীয়তাবাদী। পরবর্তীকালে তিনি মাকর্সবাদী দর্শনে দীক্ষিত হন। কর্মজীবনের শেষ স্তরে তিনি নয়া মানবতাবাদী দর্শনের প্রবক্তা হিসাবে পরিচিত হন। তাঁর অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বিশেষ ভাবে সমৃদ্ধ। সমগ্র জীবন ধরে তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। সমকালীন বিশ্বে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত ও চিন্তাবিদ। তার অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য পরিণতি লাভ করেছে তাঁর নয়া মানবতাবাদী দর্শনে। তাঁর নয়া মানবতাবাদী দর্শনের পেছনে কতকগুলি কারণ আছে যা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

মানব সভ্যতার সমকালীন সংকট সমাধানের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর দর্শন উপস্থাপিত করেছেন। মানবতার সংকট তাঁকে ভীত করেছে। তিনি সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের অপব্যবহার লক্ষ্য করেছেন। তিনি রাজনৈতিক দলীয় ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ও অমানবিক পরিণতি তাকে বিচলিত করেছিল। তিনি গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার জন্য খুবই আন্তরিক ছিলেন। এই সব কিছুর কারণে তিনি শেষ জীবনে নতুন এক দর্শনের সন্ধান করেছেন। এই ভাবে তাঁর নয়া মানবতাবাদের সৃষ্টি হয়েছে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় মার্কসবাদে অনুপ্রাণিত হন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের একটি বড় অংশ সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী বিকাশে ব্যয় হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বাধীনতার পূজারী। তিনি স্বাধীন চিন্তার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কিন্তু বাস্তব জীবনে সাম্যবাদী ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সাধারণ মানুষের স্বাধীনতাকে কার্যত অস্বীকার করা হয়েছে। সকলের স্বাধীনতা ভোগ সুনিশ্চিত হবে এমন একটি সমাজ ব্যবস্থা তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কর্মজীবনের শেষ পর্যায় তিনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী নতুন আদর্শকে গ্রহণ করেন। এই নতুন আদর্শ নয়া মানবতাবাদী দর্শন হিসাবে পরিচিত হয়।

মানবেন্দ্রনাথ রায় সোভিয়েত ইউনিয়নে বহুদিন অতিবাহিত করেছেন। তিনি চীনেও অনেকদিন কাটিয়েছেন। মার্কসীয় সমাজতান্ত্রিক

মানবেন্দ্র নাথের নয়া মানবতাবাদী দর্শন নতুন এক সমাজ দর্শনের পথ নির্দেশ করে। এই নতুন সমাজ দর্শনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে আরও বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আছে।

সমাজ ব্যবস্থার চেহারা তিনি একেবারে কাছ থেকে দেখেছেন। পরবর্তীকালে তিনি মার্কসবাদ ও সোভিয়েত সমাজবাদী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলেও সেখানে সব কিছু সাম্যবাদী দলের মুষ্টিমেয় কিছু নেতার নিয়ন্ত্রণে থাকে। গণতান্ত্রিক পথে সমাজবাদের আগমনকে উৎসাহিত করা হয়নি। এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা বিপন্ন। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে, সমাজের প্রয়োজনে শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি ধ্যান-ধারণা গড়ে ওঠে। কিন্তু মার্কসীয় দর্শন অনুসারে এই সব ধ্যান-ধারণা হলো সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রকাশ। তাঁর মতে মানুষই সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। তিনি মার্কসীয় দর্শনের অর্থনৈতিক নির্দেশবাদকে সত্য বলে স্বীকার করেননি।

মার্কসবাদের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের নয়া মানবতাবাদের পার্থক্য দেখা যায়। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থায় মানবাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়, কিন্তু বাস্তবে পুঁজিবাদী সমাজে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে মানুষের স্বাধীনতা অবহেলিত হয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সমাজের মৌলিক সমস্যাগুলির সঠিক সমাধান সম্ভব নয়। তাঁর মনে এই ধারণা গড়ে ওঠে যে সমকালীন কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শ মানবতার বিকাশে সহায়ক নয়। ফরাসি বিপ্লবের পর বিশ্বে মার্কসবাদ, ফ্যাসিবাদ, সমাজবাদ প্রভৃতি রাজনৈতিক মতাদর্শের চেহারা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে কিন্তু কোথাও ফলাফল সন্তোষজনক হয়নি। কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শ মানুষের কষ্ট দূর করতে পারেনি। তিনি দেখেছেন যে মানব সমাজের সংকটের সমাধানের ব্যাপারে সোভিয়েত ধাঁচের সমাজবাদ, উদারনীতিবাদ, ফ্যাসিবাদ প্রভৃতি মতাদর্শগুলি কোনওটাই গ্রহণযোগ্য নয়। স্বভাবতই তিনি এক নতুন রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। প্রচলিত বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের সীমাবদ্ধতাগুলি সংশোধনের জন্য তিনি নতুন এক মতাদর্শ গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগী হন।

ইউরোপের শিল্প-উন্নত দেশগুলির শিল্প উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। বৈষম্যমূলক বন্টন ব্যবস্থা দূর করার জন্য মানবেন্দ্রনাথ মনে করেন যে সাম্য ও স্বাধীনতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য এমন এক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রয়োজন যার সুফল দেশের সব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। তিনি তখনকার রাজনৈতিক মতাদর্শের উপর আস্থা রাখতে পারেননি। তাই তিনি নয়া মানবতাবাদের দর্শন গড়ে তোলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা মানব জাতির

সামনে এক বিরাট সংকটের সৃষ্টি করে। বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ে। মানুষের সব আশা ভরসা শেষ হয়ে যায়। বিশ্বব্যাপী ঐক্য, সংহতি প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়। মানবজাতি ও সভ্যতা বিপন্ন হয়ে পড়ে। বিশ্ব জুড়ে সভ্যতার সংকট থেকে মানব জাতিকে উদ্ধারের উপায় হিসাবে তিনি নয়া মানবতাবাদের পথ দেখিয়েছিলেন।

মানবতাবাদের বিষয়টি একেবারে নতুন কিছু নয়। প্রাচীনকালে গ্রীক দার্শনিকদের চিন্তাধারার মধ্যে মানবতাবাদের আদর্শের পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতে বৈষ্ণব ধর্মীয় সম্প্রদায়ের জীবন দর্শনের মধ্যে মানবতাবাদী চেতনা দেখা যায়। বিশ্ববন্দিত রাসেল ছিলেন একজন বিশিষ্ট মানবতাবাদী। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন বিখ্যাত মানবতাবাদী। মানবতাবাদ হলো এক বিশেষ দার্শনিক ধারণা। এই ধারণার মধ্যে কোনও কাল্পনিক শক্তি নেই। মানুষের মন এবং মেধাই হলো যথার্থ শক্তি। মানবতাবাদে ধর্ম-নিরপেক্ষ রাজনীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাঁর মতে মানবতাবাদ হলো মানুষের মর্যাদা ও সার্বভৌমত্বের এক প্রাচীন মতবাদ।

মানবেন্দ্রনাথ রায় হলেন আধুনিক ভারতের প্রথম সারির মানবতাবাদীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁর মানবতাবাদী দর্শন পূর্বতন চলে আসা মানবতাবাদী ধারণা থেকে অনেকখানি আলাদা। ইতিহাস ও বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি মানুষকে নতুনভাবে দেখেছেন, সভ্যতার অগ্রগতি এবং বিজ্ঞানের বিকাশ মানবজাতি ও সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। এই বিজ্ঞানসম্মত নতুন দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে তিনি মানবতাবাদী দর্শনের আলোচনা করেছেন। এই কারণে এই মানবতাবাদকে ‘নয়া মানবতাবাদ’ বলা হয়। এটা হলো বিজ্ঞানভিত্তিক। মানুষের সৎ ও শুভ জীবন ধর্মের উপর এই মানবতাবাদী দর্শন আস্থাশীল। মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে তাঁর নয়া মানবতাবাদ দর্শন। সব রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের সৃষ্টি ও সম্প্রসারণ এবং যাবতীয় কাজকর্মের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বিষয় হলো ব্যক্তি। তিনি ব্যক্তির উপর সার্বভৌমত্ব আরোপ করেছেন।

মানবেন্দ্রনাথ রায় নয়া মানবতাবাদের আলোচনায় সার্বভৌম মানুষের জয়গানে মুখর হয়েছেন। বর্তমানে মানুষের মৌল সত্তা সামাজিক ও রাজনৈতিক পীড়নে অতিমাত্রায় জর্জরিত। বর্তমানে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন। তিনি মানবতাবাদী মূল্যবোধের পুনরায় জাগরণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তিনি উদারনৈতিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন বস্তুবাদী দার্শনিক। বস্তুবাদী ও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার বিকাশে তাঁর অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি অবৈজ্ঞানিক ও অতিলৌকিক চিন্তাধারার বিরোধী ছিলেন। তিনি বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবাদী নীতিতত্ত্বের প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে যত্নবান ছিলেন। আধুনিক ভারতে বিজ্ঞানসম্মত মানবতাবাদের বিকাশ ও বিস্তারে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। তিনি নয়া মানবতাবাদী সমাজের নতুন শিক্ষানীতির কথা বলেছেন। এই শিক্ষানীতি অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত হবে। তিনি সমাজে সর্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের উপর জোর দিয়েছেন।

নয়া মানবতাবাদে মানবেন্দ্রনাথ রায় মানুষের মুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অশুভ শক্তির বিনাশের মাধ্যমে মুক্তি সম্ভব। মুক্তি সাধনাই হলো জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার বিষয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে মুক্তির আবেগ থাকে। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মতে, মুক্তির আকাঙ্ক্ষা অস্তিত্বের সংগ্রামের মধ্যে দেখা যায়। তার বিশ্বতত্ত্ব বস্তুবাদী। তাঁর মতে মানবজাতির চরম লক্ষ্য হলো মুক্ত মানুষের এক মুক্ত সমাজ। এই সমাজ হবে বিশেষ ভাবে উন্নত। মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হবে। মানুষের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকবে। সমাজে সকলে সুখী ও সুন্দর জীবন লাভ করবে। তিনি ছিলেন সন্দেহহীন এবং দৃঢ় বিশ্বাসী।

তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তিনি সকলের হাতে স্থায়ীভাবে সার্বভৌম ক্ষমতা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতাকে সমর্থন করতে পারেননি। জনগণের হাতে যাতে সার্বভৌমত্ব থাকে তা সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি নতুন ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করেছেন। তিনি পঞ্চায়েত ব্যবস্থার উপর জোর দিয়েছেন। তিনি প্রত্যেক গ্রামে গ্রামসভা গড়ে তোলার কথা বলেছেন। গ্রাম সভার মধ্যে মানুষ সংগঠিত হবে এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। গ্রাম সভার সদস্যরা গ্রাম পঞ্চায়েতকে নির্বাচিত, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করবে। এইভাবে দেশে রাষ্ট্রব্যবস্থা সংগঠিত হবে। নয়া মানবতাবাদী সমাজে জনগণের মধ্যে এক নব জাগরণ দেখা দেবে।

মূল্যায়ন :

মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নয়া মানবতাবাদী দর্শন বিতর্কিত দর্শন। মার্কসবাদী, গান্ধীবাদী সব রাষ্ট্র দার্শনিক মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নয়া মানবতাবাদের সমালোচনা করেছেন। সমালোচকরা অভিযোগ করেন যে বিশেষ কোনও রাজনৈতিক মতাদর্শে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল না। মার্কসবাদের শ্রেণী শোষণ ও শাসনের সত্যটিকে নয়া মানবতাবাদে অস্বীকার করা হয়েছে। সমাজে এক শ্রেণীর ওপর আর এক শ্রেণীর শোষণ পীড়নের অবসানের ব্যাপারে কোনও সুস্পষ্ট পদ্ধতির কথা বলা হয়নি। নয়া মানবতাবাদে অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিপ্লবের পরিবর্তে সমবায়ী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা বলা হয়েছে। তিনি ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদী ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাগুলিকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। জীবনের শেষ দিকে তিনি বস্তুবাদী মতাদর্শকে বাতিল করে ভাববাদী ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের দর্শনকে গ্রহণ করেছেন। এই নয়া-দর্শনের কোনও ব্যবহারিক মূল্য নেই। এটি সাধারণ মানুষের মধ্যে কোনও আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারেনি। নয়া মানবতাবাদের সামাজিক স্তর বিন্যাসের বিষয়টিকে অবহেলা করা হয়েছে। এই দর্শন অনেকখানি ভাবাবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

পরিশেষে এই নয়া মানবতাবাদের বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও এই মতবাদকে অস্বীকার করা যায় না। তিনি তাঁর নতুন সমাজ দর্শনে মানবতাবাদের মৌলিক আদর্শগুলির বাস্তবায়ন এবং মানুষের মননশীলতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই পথেই মানব সমাজের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠন সম্ভব। তার নয়া মানবতাবাদী দর্শন নতুন এক সমাজ দর্শনের পথ নির্দেশ করে। এই নতুন সমাজ দর্শনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক দিয়ে আরও বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আছে।

(মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত)

সীমান্ত প্রণাম : এক অভিনব কার্যক্রম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ১৯৬২। ভারত আর ভারতীয় নাগরিকদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই বছর পাক্-আক্রমণের ৬৫ বছর, চীন আক্রমণের ৫০ বছর আর সংসদের উপর হামলার ১০ বছর। তাই দেশের অখণ্ডতা ও সীমান্ত সুরক্ষার বিষয়টি স্মরণে রেখে 'সীমান্ত প্রণাম'-এর এক অভিনব আয়োজন। উদ্যোক্তা 'ফোরাম ফর ইনট্রিগ্রেটেড ন্যাশনাল সিকিউরিটি' সংক্ষেপে 'ফিনস'।

গত ২৩ নভেম্বর শিলিগুড়ির জার্নালিস্ট ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে (বাঁ দিক থেকে) সঞ্জীব শর্মা, বাসুদেব পাল, জগদীশ প্রসাদ আগরওয়াল, বিপুল রায় ও জয়রাম মণ্ডল।

সীমা শুধু কাঁটাতারের বেড়া নয়, সীমা হচ্ছে দেশের স্বাভিমান। তাই তার সুরক্ষা যেমন মজবুত হওয়া দরকার, তেমন জরুরি সদাসতর্ক নজরদারি। আর এজন্য চাই জাগ্রত সমাজ। দেশের সাধারণ মানুষ, বিশেষত যুবসমাজ নিজেদের মাতৃভূমি ভারতের সীমারেখা দেখে ও বোঝে— এটাও জরুরি। সীমান্তে বসবাসকারী নাগরিকরা কেমনভাবে জীবনযাপন করেন, কৃষি, পশুপালন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সেখানে কেমন, শিক্ষার প্রসার কতটা হয়েছে, মৌলিক চাহিদাগুলির মেটানোর ব্যবস্থাই বা সেখানে কিরকম এবং সীমান্ত রক্ষাকারী জওয়ানরা কিরকম সমস্যা-সংকটের মোকাবিলা করতে করতে প্রতি মুহূর্তে কষ্ট সহ্য করছে— এই সমস্ত জানা ও অনুভব করা— দেশের প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য।

সাল	বেদখল জমি (বর্গ কি.মি.)	
১৯৪৭	৮৩,০০০	কাশ্মীরের ওপর পাক অধিকার
১৯৬০		বেরুবাড়ির ওপর পাক অধিকার
১৯৬২	৮০,০০০	চীনের সিয়াচীন, কৈলাশ মানস সরোবর এবং উত্তর-পূর্বের হিমালয়ান ভূ-ভাগ অধিকার
১৯৬৫	৫০০	রণ কচ্ছ, গুজরাট
১৯৭১		ছম্ব-র (জম্মু) ওপর পাক অধিকার
১৯৭৩		কাচ্চা তিবু (শ্রীলঙ্কা)
১৯৮৫	প্রায়	নিউ মূর ছিট মহল (বাংলাদেশ)
১৯৯২	২৩,৫০০	তিনবিঘা ছিল মহল (বাংলাদেশ)
১৯৯২		সমুদ্রের মাঝে কোকো দ্বীপ (ম্যাঁমার)
২০১১		অসম এবং বাংলার বিশাল ভুভাগ (বাংলাদেশ)
সর্বমোট—১,৮৭,০০০ বর্গকি.মি.		

সীমান্তে সৈনিকরা যেমন রক্ষক, সেখানকার বাসিন্দারাও তেমনই স্থায়ী প্রহরী। হাজার হাজার জওয়ান ও নাগরিকের আত্মাহুতি দেওয়ার পরেও ভারতের আয়তন কমে গিয়েছে। ১৯৪৭ সালে যা ছিল ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার বর্গকিলোমিটার ২০১২-তে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৩১ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ গত ৬৫ বৎসরে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার বর্গকিলোমিটার ভারতের জমি প্রতিবেশী দেশের দখলে চলে গেছে। তাই দেশের নেতা এবং নীতি এমন হবে যাতে ভারতের অখণ্ডতা বজায় থাকে, দেশের মানুষের জীবনহানি যেন না হয়। অনুপ্রবেশ না ঘটে।

পাক-অধিকৃত কাশ্মীর আর চীন-অধিকৃত কৈলাশ দখলদারীদের কাছ থেকে মুক্ত করতে হবে। তাই দেশের মানুষকে বিশেষত সীমান্তে বসবাসকারী দেশবাসীকে সচেতন করতে ভারতে যুবকরা নিজের নিজের গ্রামের পবিত্র জল দিয়ে সীমার অভিষেক করবে এবং সীমার পবিত্র মাটি নিজের এলাকায় নিয়ে গিয়ে ফোঁটা দিয়ে প্রত্যেক নাগরিককে তিলক দেবে। 'সীমান্ত প্রণাম' কার্যক্রমের স্লোগান তাই— 'দেশ কী রক্ষা ধর্ম হমারা, দেশ কী সেবা কর্ম তোমারা।' দেশ রক্ষাই আমাদের ধর্ম, দেশ সেবাই আমাদের কর্ম।

উত্তরবঙ্গে ‘সরহদ কো প্রণাম’

জয়রাম মণ্ডল

যখনই ফোন করি, প্রথমেই ‘সরহদ কো প্রণাম’ বলে। তারপরে মূল বিষয়ে প্রবেশ। সুদূর কেরল থেকে কাশ্মীর, গুজরাট থেকে অসম পর্যন্ত ছিল একই বাণী। এস এম এসে পর্যন্ত প্রথমেই ‘সরহদ কো প্রণাম’ দিয়ে সম্বোধন। কেন্দ্রীয় স্তরে একটাই ই-মেল ছিল— সরহদ কো প্রণাম। দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরহদ কো প্রণাম বলা হোত। একটি গান ছিল সারাদেশের জন্য ‘সরহদ তুঝে প্রণাম’— যে কোনও মানুষের হৃদয় স্পর্শ করতে পেরেছে এই গান। সারা ভারতের দশ হাজার যুবকের কণ্ঠস্থ— ‘সরহদ তুঝে প্রণাম’।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসে যায়— এই কার্যক্রমের মূল উদ্‌গাতা কে? এফ আই এন এস (ফিনস) নামক একটি সংস্থা। আর এই সংস্থায় কারা ছিলেন? তাঁদের প্রেরণার উৎসই বা কোথা থেকে? এই সব প্রশ্নের উত্তর হলো— আর এস এস অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ। এই সংস্থায় যাঁরা আছেন তাঁরা সবাই সেবাপরায়ণ সেনা অফিসার, পুলিশ প্রশাসনিক অফিসার, বিচারক, সুরক্ষা বিশেষজ্ঞ, মিডিয়া কর্মী, আইনজ্ঞ ও দেশভক্ত নাগরিক। ফিনস (Forum for Integrated National Security) এদের দ্বারাই পরিচালিত। এই অভিনব কার্যক্রম, সীমা প্রণামের আয়োজক।

এই ফিনস-কে যাঁরা সহযোগিতা করছেন এমন সংগঠনগুলি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আর এস এস), অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এ বি ভি পি), সীমা জনকল্যাণ সমিতি, পূর্ব সৈনিক সেবা পরিষদ। এই চারটি সংগঠনই দেশাত্মবোধক সংগঠন। দেশপ্রেম জাগানোই এইসব সংগঠনের মূল উদ্দেশ্য।

২০০৩ সালে স্থাপিত হয় ফিনস। ২০১২ সাল ভারত এবং ভারতীয় নাগরিকদের কাছে এক গুরুত্বপূর্ণ বছর। এটা প্রথম পাক-আক্রমণের ৬৫ বৎসর, চীন আক্রমণের ৫০ বছর ও সংসদের উপর হামলার ১০ বছর পূর্ণ হওয়ার বছর। ফিনস-এর মার্গদর্শক ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় কার্যকারিণীর সদস্য শ্রী ইন্দ্রেশ কুমার। এ বছরের জুন মাসে দিল্লীতে প্রথম অধিবেশনেই সরহদ প্রণামের রূপরেখা ও কার্যক্রম কেমন হবে তা রচনা করেন শ্রী ইন্দ্রেশজী। প্রতিটি প্রান্তের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল এই বৈঠকে। ২৫০ জন প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। আমার সৌভাগ্য হয়েছিল উত্তরবঙ্গের প্রান্ত প্রমুখ হিসাবে উপস্থিত থাকার।

শিলিগুড়ি বেস ক্যাম্পে ফিনসের কার্যকর্তাদের সম্বোধন করছেন আর এস এসের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত প্রচারক গোবিন্দ ঘোষ। রয়েছেন অন্যান্য অধিকারীরাও।

সঙ্ঘের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের একমাত্র প্রান্ত উত্তরবঙ্গ যা প্রতিবেশী দেশ নেপাল, চীন, ভুটান ও বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা। শিলিগুড়িকে উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার (Gateway of India) বলা হয়। চিকেন নেক-ও উত্তরবঙ্গেই অবস্থিত। চীন-বাংলাদেশের করিডর এই উত্তরবঙ্গ দিয়েই শুরু। উত্তর-পূর্ব ভারতকে যেমন বিচ্ছিন্ন করার প্রয়াস চলছে তেমনি উত্তরবঙ্গকে আলাদা করার প্রয়াসও জারি আছে। ছিটমহলগুলিকে ক্রমশ গিলে ফেলছে বাংলাদেশ। ভারতবর্ষের সীমানা ক্রমশ ছোট হতে বসেছে। সরহদ প্রণাম কার্যক্রমের মূল

দক্ষিণ দিনাজপুরের সদর শহর বালুরঘাটের কামদেবপুরে দেশের পতাকা হাতে সীমান্তবাসীদের সঙ্গে ফিনসের কার্যকর্তাদের অন্তরঙ্গ মুহূর্ত।

উদ্দেশ্য যেমন সীমান্তের মানুষকে সচেতন করা, তেমনই সীমাকে আর ছোট হতে না দেওয়া।

এই হিসাবে ১২টি আধার শিবির (বেস ক্যাম্প) রচিত হয়েছিল। ৪২টি সীমা চৌকি গঠন করা হয়েছিল। ২০ জন করে এক একটি দল তৈরি করা হয়েছিল। উত্তর মুর্শিদাবাদ রঘুনাথগঞ্জ বেস ক্যাম্প ২টি, মালদায় ৫টি, বালুরঘাটে ৫টি, রায়গঞ্জে ৭টি, ঈশ্বরপুরে (ইসলামপুর) ৩টি, আলিপুরদুয়ারে ৩টি, কোচবিহারে ৩টি, মাথাভাঙায় ৪টি, জলপাইগুড়িতে ৫টি, শিলিগুড়িতে ৪টি, দার্জিলিংয়ে ১টি, সিকিমে ১টি— মোট ৪২টি সীমা চৌকি তৈরি করা হয়। ৩২টি প্রান্ত থেকে মোট ৮০০ জন অংশগ্রহণকারী ৫৮১টি সীমান্তবর্তী গ্রামে ৮৪,২০০ জনের সঙ্গে সম্পর্ক করে। মানব শৃঙ্খলায় অংশগ্রহণ করেছিল ৫৪৪০ জন।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার থেকে ৫ জন উত্তরাখণ্ডের পিলভিটে, শিলিগুড়ি থেকে ৭ জন পাঞ্জাবের ফিরোজপুরে দিনাজপুর থেকে ১০ জন জম্মু-কাশ্মীরে, মালদা থেকে ৯ জন রাজস্থান জয়সলমীরে। মোট ৩১ জন অংশ নিয়েছিল সরহদ প্রণাম কার্যক্রমে।

সীমা প্রণামের কার্যক্রমে ১০০০ জন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রত্যক্ষ দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছে। বিভিন্ন প্রান্তের ভাষা, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদ, কোন বাধাই ছিল না। মনে হচ্ছিল যেন কোনও পরম আত্মীয় আমার বাড়িতে এসেছে। বি এস এফ ক্যাম্পগুলিতে যখন পৌঁছানো হলো তখন এক আশ্চর্যের বিষয় দেখা গেল। নিজের নিজের প্রান্তের, নিজের নিজের ভাষাভাষি লোকেদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ে আমরা যে সবাই এক মায়ের সন্তান তাদের কথার মধ্যে ফুটে উঠেছিল। বি এস এফ যেমন তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বলেছে, তেমনি গ্রামাঞ্চলের লোকেরাও নানান সুবিধা-অসুবিধার কথা তুলে ধরেছে।

বি এস এফ-এর জওয়ানরা বলেছেন আমাদের গুলি চালানোর ক্ষমতা সরাসরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। ফলে চোরাকারবারীরা সুবিধা পেয়ে গেছে। এই কার্যক্রমে বি এস এফ-এর বন্ধুরা বুঝতে পেরেছে গ্রামবাসীরাই সীমান্তের প্রকৃত প্রহরী। গ্রামাঞ্চলের লোকেরা বলছে আমরা সীমানায় বাস করি বলে বলে রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও নজর আমাদের উপর নেই। যার জন্য রাস্তাঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থা, আলো, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার বহু ত্রুটি রয়েছে। চাষীদের চাষ করার জন্য তারকাঁটার ওপারে যাতায়াত এক জটিল সমস্যা। এত কিছু সমস্যার পিছনে আমাদের দেশের লোকেরা বা সীমান্ত রক্ষী-প্রহরীরাই সমস্যার মূল কারণ। অর্থাৎ সর্ষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে গো-পাচার, জাল নোট, স্মাগলিং, নদীর মধ্যে বালি-পাথর অবাধে নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ চোরাচালানের কোনও অসুবিধাই নেই। বাংলাদেশের লোকেরা নদীর পুরোভাগ দখল করে তাদের কাজ করে নিচ্ছে। তারকাঁটার ওপারের জায়গায় আমাদের লোকেদের জমিগুলি ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে।

সীমান্তবাসীদের এই সমস্ত সমস্যা সকলের জানা এবং অনুভব করা দেশের প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। তাই আজ থেকে আমাদের সংকল্প হোক—সুরক্ষিত সীমা, বিকশিত দেশ, জাগ্রত সমাজ। জনে জনে সজোরে ডাক দেওয়া হোক— সীমাবাসী আমাদের। শহীদ হচ্ছে আকাশের তারা— ভারতমাতার আদরের ধন। সীমা থেকে এসেছে সন্দেশ (খবর)— অখণ্ড থাকবে ভারতদেশ।

শিলিগুড়িতে ভারত-বাংলাদেশ, ভারত-তিব্বত এবং ভারত-নেপাল সীমান্ত পরিদর্শনে আসা ফিন্‌সের সদস্যরা।

শিলিগুড়ি বেসক্যাম্প থেকে রওনার পথে।

সীমান্তের অসহায় মুখগুলি আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে

সুভাষ নন্দী

একদল আত্মবিশ্বাসী যুবক অদম্য উৎসাহে বীরদর্পে এগিয়ে চলেছেন, বাংলাদেশ সীমান্তের পথে পাশে কাঁটাতারের উঁচু ফেন্সিং, চলেছেন তাঁরা অখণ্ড ভারতের স্বপ্নে খণ্ডিত ভারতের সীমার টানে। মাথায় সাদাটুপি, সামনে দলপতির কাঁধে গেরুয়া পাট্টা, লেখা 'সরহদ তুঝে প্রণাম', কাঁধে লাঠির মাথায় তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা, কণ্ঠে ধ্বনি— বন্দেমাতরম্, ভারতমাতা কী জয়। গীত— দেশ কী রক্ষা ধর্ম হামারা, দেশ কী সেবা কর্ম হামারা— সরহদ তুঝে প্রণাম। চলেছেন পাকিস্তান সীমান্তে, চলেছেন চীন সীমান্তে, চলেছেন তিব্বত, নেপাল, বার্মা-সীমান্তে।

সীমান্তের গ্রামবাসীদের সঙ্গে ফিন্‌সের সদস্যরা।

গত ১৯ থেকে ২৩ নভেম্বর পাঁচদিন ধরে চললো এক অখিল ভারতীয় কার্যক্রম ''সরহদ কো প্রণাম''— মানে সীমান্তকে প্রণাম। সম্পূর্ণ কার্যক্রমের পরিচালনার দায়িত্ব ছিল এফ আই এন এস (ফোরাম ফর ইন্টিগ্রেটেড ন্যাশনাল সিকিউরিটি)-এর উপর। দক্ষিণবঙ্গে এর দায়িত্ব ছিল সীমা জনকল্যাণ সমিতির উপর।

'সরহদ কো প্রণাম'— এই শব্দের ভিতর লুকিয়ে ছিল এক অসীম মন্ত্রশক্তি যা সারা ভারতের নবপ্রজন্মের যুবসমাজকে দিল নূতন জীবনের দিশা, সমাজ ও সীমান্তের জন্য ভাবনা। সারা ভারতে নূতন প্রজন্মের ১৮ থেকে ৩৫ বৎসরের যুবকরা হাজারে হাজারে ভ্রমণ করে গেল দেশের বিভিন্ন সীমান্ত। এঁরা এসেছিলেন দেশের সকল প্রদেশের সব জেলা থেকেই— কোথাও দশজনে একজন দলপতি, কোনও জেলার বিশজনে একজন দলপতি।

ফিন্‌সের সদস্যদের হাতে বোনেরা রাখী বেঁধে দিচ্ছেন।

উদ্দেশ্য ছিল দেশের ইতিহাস জানা, ভূগোল জানা, সীমাবর্তী মানুষ, গ্রাম ও সৈনিকদের জানা, আবহাওয়া, বৃক্ষ ও পশুপাখি জানা এবং সেইসঙ্গে দেশভক্তির জাগরণ।

এই কার্যক্রমে যোগদানের জন্য যুবকদের বিভিন্নরকম যোগ্যতামানের পরীক্ষা পার করে তবেই আসবার সুযোগ হয়েছে— সঙ্গে ডাক্তারের মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট ও নিজ ঘোষণাপত্র জমা দিতে হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ থেকে ৯ জন যুবক গত ১৮ নভেম্বর আলিপুরদুয়ার যাত্রা করেছিল।

দক্ষিণবঙ্গের ১০৮৫ কিমি সীমান্তের ভিতর প্রায় ৩১১ কিমি জলসীমা। ৪ জেলায় ছিল ৬টি আধার শিবির বা বেসক্যাম্প। যেখানে যুবকরা এসে প্রথম উঠবে।

মুর্শিদাবাদ জেলার কাশিমবাজার ও দেবীপুর, নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর ও তেহট্ট সীমায়, বারাসত মহকুমার বাজীৎপুর সীমান্তে ও বসিরহাট মহকুমার সদরে শিশু মন্দিরে।

১৯ নভেম্বর দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত আধার শিবিরে যুবকরা পৌঁছাতে থাকেন। ২০ নভেম্বর একদিনের ট্রেনিং শেষে যোজনামতো ৪২ টা সীমা চৌকির প্রমুখ দুপুর ২টার পর নিয়ে গেল সীমান্তের গ্রামে— যেখানে যুবকদের বরণ করার জন্য উপস্থিত আপন করা। সীমা ও গ্রামের পথে ১০ থেকে ১৫ কিমি হেঁটে ওঁরা সকলকে পরিয়ে দিয়েছে 'রক্ষা সূত্র' বা দাগা। নিজ গ্রামের তীর্থস্থান থেকে আনা পবিত্র জল দিয়ে সীমান্তকে করেছে অভিষেক, নত মস্তকে স্মরণ করেছে স্বাধীনতা সংগ্রামী শহীদদের, বীরদের। জেনেছে সীমান্তবর্তী মানুষের জীবনযাত্রার পরিচয়, বর্তমান সীমান্তের সমস্যা, গ্রামের মানুষের হাঁড়ির খবর। দুর্বল প্রশাসনের ও

সীমান্ত ফিন্‌স-এর একটি দল।

ছিল গ্রামের অসংখ্য মানুষ। কপালে চন্দনের টিপ, গলায় মালা, উলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে পুষ্পবৃষ্টি, যেন বাড়ির ছেলে অনেকদিন পর বাড়ি ফিরে এল। ২০ নভেম্বর বিকাল থেকে ২২ নভেম্বর বিকাল পর্যন্ত যুবকরা সীমান্তের প্রায় ৪৬৭টা বাড়িতে ছিলেন। দেশের প্রায় সকল প্রদেশ থেকেই দক্ষিণবঙ্গে ৩৭৬ জন এসেছিল। গ্রামে যোগ দিয়েছিল ৩৫৭ জন স্থানীয় যুবক যাঁরা সারাক্ষণই এদের সঙ্গে ছিলেন। সহায়তা করেছেন অসংখ্য গ্রামবাসী। এঁরা বিভিন্ন ভাষাভাষী হলেও মাত্র তিন ঘণ্টায় শেখা বাংলা ভাষা দিয়ে জয় করে ফেললেন গ্রামের মানুষের হৃদয়। থাকা ও আহারের ব্যবস্থা গ্রামের ঘরে ঘরে।

২১ নভেম্বর সকাল থেকে ছিল গ্রামের মানুষের এবং বি এস এফ সীমা সৈনিকদের অসহায় সীমা সৈনিকদের কথা। বহু বি ও পি-তে সৈনিকরা যুবকদের বুকে জড়িয়ে ধরেছে, জল দিয়েছে, চা দিয়েছে, একসঙ্গে বসে খাবার খাইয়েছে, ধ্বনি দিয়েছে, গান গেয়েছে। নিজের ঘরের গল্প, দেশের কথা, সীমান্তের কথা শুনিয়েছে। যুবকদের হাতে তুলে দিয়েছে নিজের রাইফেল, গুলি হাতে দিয়েছে দেখবার জন্য— সব চিনে নাও, জেনে নাও— এরপর তোমরাই তো সৈনিক হয়ে আসবে আমাদের জায়গায়।

২২ নভেম্বর সকাল ১১টায় ছিল— "সীমা রক্ষা শৃঙ্খলা" (মানব শৃঙ্খল)। যুবকরা সীমাসৈনিক ও গ্রামবাসীদের নিয়ে বানিয়েছিল এক বিরাট হৃদয়স্পর্শী মানবশৃঙ্খল, যেখানে গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা অংশগ্রহণ করেন। এই সময় সীমান্তের কোনও মানুষই নিজেকে আলাদা করে রাখতে পারেননি। ভাষা কোনও অন্তরায় হয়নি, তাই গ্রামের সকলকেই যুবকদেরকে হৃদয়ে স্থান দিতে পেরেছিল। বিদায়কালে গ্রামের মানুষকে চোখের জলে ভাসিয়ে যুবকদের বিদায় নিতে হলো। রওনা এবার আধার শিবিরে। ২৩ নভেম্বর সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ছিল অনুভব লেখা ও বলা— যা দেখল যা শুনলো যা বললো, সব অনুভব লিপিবদ্ধ করা। সকল অনুভব 'ফটো কম্পোজ'-এ লোড করে নেওয়া হয়েছে ও যথাসময়ে দিল্লীতে মেল করা হয়েছে।

এবার ঘরে ফেরার পালা। আধার শিবির থেকে দুপুর ১টায় নিজ গন্তব্যে যাত্রা— সঙ্গে নিয়ে গেল কলকাতার মোয়া, কালীঘাট ও দক্ষিনেশ্বরের মা কালীর প্রসাদ, সিন্দুর, মাটি আর গ্রামের মায়েদের আশীর্বাদ।

সীমান্তে নব যুবকরা দেশবাসীর কাছে ঘোষণা করল— "আমরা আছি। তোমরা আমাদের স্বার্থপর ভেবে অবহেলা ভরে দূরে সরিয়ে রোখো না। আমরা দেশবাসী ও দেশমাতৃকাকে ভুলিনি, আমরা মাতৃঋণ শোধ করেই যাবো। আমরা সীমান্ত দেখে গেলাম, জানি সৈনিকরা বলেছে সীমার ওপারও আমাদের, ওপারের মাটি নিয়ে গেলাম, দেশবাসীর কপালে তিলক কেটে দেব যাতে আমার এই অনুভব ও উপলব্ধি সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। গ্রামের মানুষদের ও সীমা সৈনিকদের বুকে জড়িয়ে আপন করে নিলাম। সীমান্তের মানুষগুলো যে খুব 'একা', কীভাবে জীবনধারণ করবে তারা। প্রতিনিয়ত চোরাকারবারীরা তাদের লোভ দেখাচ্ছে। সংসারের অভাব নিয়ে কতক্ষণ সৎ থাকবে? ভাই, পৌঁছাও তাদের কাছে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দাও। বলো তোমরা আমাদেরই। বেঁচে থাকার জন্য যে তাদের প্রতিদিন ঈশ্বরকে ডাকতে হচ্ছে। আপনারা তো সীমান্তের খবর কাগজে পান— তবে কেন নিশ্চুপ? এগিয়ে আসুন। 'সীমান্তকে প্রণাম' সফল করুন। ওদের অসহায় মুখগুলো যে আপনাদের অপেক্ষায় আছে।

চিঠিপত্র

হিন্দু মন্দিরে সরকারি হস্তক্ষেপ

আমেরিকাবাসী জনৈক স্টিফেন ন্যাপের লেখা বই ‘Crimes against India and need to protect Ancient Vedic Tradition’ থেকে জানা যাচ্ছে, ভারতের বহু হিন্দু মন্দিরের আয় রাজ্য সরকারগুলি যদৃচ্ছভাবে খরচ করছে (স্বস্তিকার ২৫ জুন, ২০১২)। ১৯৫১ সালের Hindu Religions & Charitable Endowment আইনের বলে যে কোনও সময় রাজ্য সরকারগুলি হিন্দু মন্দিরগুলি অধিগ্রহণ করতে পারে ও মন্দির সংক্রান্ত সমস্ত সম্পত্তির উপর পূর্ণ অধিকার কায়েম করতে পারে।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ৪৩ হাজার মন্দির অধিগ্রহণ করেছেন। মন্দিরগুলির আয়ের ১৮ শতাংশ মন্দির কর্তৃপক্ষকে খরচের জন্য দেওয়া হচ্ছে। বাকি অর্থ সরকার বিভিন্ন খাতে খরচ করছেন। তিরুপতি মন্দিরের আনুমানিক বার্ষিক আয় ৩১০০ কোটি টাকার ৮৫ শতাংশ সরকার অন্য খাতে ব্যয় করছেন। ১০টি মন্দির ভেঙে যেখানে গল্ফ কোর্স তৈরি হচ্ছে, উনি লিখেছেন দশটি মসজিদ ভাঙা হলে ভারতবর্ষে ডামাডোল হোত।

কর্ণাটকেও মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের নিজস্ব অর্থ নেই বলে কয়েক হাজার মন্দির সরকার বন্ধ করে দিয়েছেন। কেরলের গুরুভায়ুর মন্দির থেকে সংগৃহীত বিপুল অর্থ অন্য কাজে ব্যয়িত হচ্ছে। আয়াপ্পা মন্দিরের কয়েক হাজার একর জমি ও বনভূমি চার্চ কর্তৃপক্ষের করায়ত্ত হয়েছে। ওড়িশার জগন্নাথদেবের ৭০ হাজার একর জমি রাজ্য সরকার বিক্রি করে নিজেদের পুঞ্জীভূত দেনা মিটিয়েছেন।

সমস্ত মন্দির কর্তৃপক্ষ ও হিন্দু জনসাধারণের কাছে আবেদন রাখছি তাঁরা যেন বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলেন ও সরকারের কাছে নিম্নলিখিত দাবিগুলি রাখেন—

(১) উপরে লিখিত আইন ও অন্যান্য এই রকম কোনও আইনে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কর্তৃক হিন্দু মন্দিরের অর্থ ও সম্পত্তিতে অধিকার কায়েম করার কোনও ব্যবস্থা থাকলে সেগুলি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

(২) হিন্দু-মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয়ের পর আয়ের উদ্বৃতাংশ ও সম্পত্তি কেবলমাত্র হিন্দু স্বার্থের জন্যই খরচ করা যাবে।

(৩) উদ্বৃত্তের কিছু অংশ বন্ধ করা মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খরচ করা যেতে পারে, যাতে স্থানীয় হিন্দুদের সুবিধা হয়।

(৪) বৎসরে এক/পাঁচ কোটি টাকার আয়ের বেশি মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের ও আয়ে-ব্যয়ের উপর নজরদারি রাখার জন্য কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হিন্দু সদস্যদের নিয়ে ট্রাস্ট গঠন করতে হবে। কোনওভাবেই এই আয়-ব্যয়ের উপর কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। যেহেতু হিন্দুমন্দিরের ট্রাস্ট, সদস্যরা ‘ধর্মনিরপেক্ষ’ হবেন না। আয়ের ভিত্তির উপর সদস্যসংখ্যা নির্ভর করবে।

এই সমস্ত ট্রাস্টের হিসাব পরীক্ষক ‘ক্যাগ’ হবে।

—হৃষীকেশ কর, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪।

দুর্নীতি ও কংগ্রেস

সোনিয়া মাইনো গান্ধীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস ও কংগ্রেস পরিচালিত ইউপিএ সরকার দুর্নীতি-কেলেঙ্কারির শিরোপা লাভ সে করেছে। ’৫২ সালে কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু জিপ-কেলেঙ্কারি (Jeep-gate) দিয়ে দুর্নীতির ইনিংস শুরু করেছিলেন, আর বর্তমান কংগ্রেসি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং কয়লাখনি বন্টন-কেলেঙ্কারি (coal-gate) নামক ইনিংস খেলে চলেছেন। ফলে নিঃস্ব, রিক্ত ভারত আজ ধুঁকছে। একদা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জী (বর্তমান রাষ্ট্রপতি) বলেছিলেন, “দেশের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়।” তিনি যথার্থই বলেছিলেন। কারণ প্রায় অর্ধ-শতক ধরে কংগ্রেস ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা কেন্দ্রে ও বিভিন্ন রাজ্যে যে ‘হরির লুট’ চালিয়েছে তাতে এদেশের কোষাগার যে ‘ভাঁড়ে মা ভবানী’-তে পরিণত হবে তাতে আর আশ্চর্যের কী?

রাজীব গান্ধীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে ‘বোফোর্স’-কেলেঙ্কারি এদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলকে যথেষ্ট তোলপাড় করেছিল। এর পরবর্তী বড় কেলেঙ্কারি টু-জি স্পেকট্রাম। রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ ১ লক্ষ ৭৬ হাজার কোটি টাকা (প্রায়)। টেলিকমমন্ত্রী এ. রাজার শুধু মন্ত্রিত্বই যায়নি, যেতে হয়েছে জেলে আর্থিক দুর্নীতির দায়ে। অভিযোগ, নিলাম না ডেকে ‘আগে এলে আগে পাবে’ নীতি অবলম্বন করে কয়েক হাজার কোটি টাকা কমিশন বা উৎকোচ নিয়েছেন কয়েকটি পরিচিত সংস্থার কাছ থেকে ডিএমকে ও কংগ্রেসের বহু নেতা-মন্ত্রী। স্পেকট্রাম বন্টন নীতি যে সঠিক ছিল না এবং তার ফলশ্রুতিতে যে সরকার ওই পরিমাণ টাকার রাজস্ব হারিয়েছে তাও জানিয়েছে ‘ক্যাগ’। তবে আপাতত সর্বশেষ দুর্নীতির বোমাটিও ফাটিয়েছে ‘ক্যাগ’। তার সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট থেকে জানা গেছে যে কয়লাখনি বন্টনে সরকার রাজস্ব হারিয়েছে আরও বেশি, ১ লক্ষ ৮৬ হাজার কোটি টাকা, যা সর্বকালের রেকর্ড ক্ষতি। এক্ষেত্রেও কংগ্রেসের নেতা-মন্ত্রীরা হাতিয়েছেন কমিশন হাজার হাজার কোটি টাকা বণ্টিত খনি প্রাপক বেসরকারি সংস্থাগুলির কাছ থেকে। আর এই কয়লা-দুর্নীতিতে জড়িয়েছেন খোদ প্রধানমন্ত্রীও। কারণ খনি বন্টনের সময় কয়লামন্ত্রকের দায়িত্ব ছিল তাঁর ঘাড়ে। তাই তাঁরও পদত্যাগ করা উচিত।

কাজেই ইউপিএ (কংগ্রেস পরিচালিত) একটি সরকারের রাজত্বকালে দেশের আর্থিক ক্ষতি যদি প্রায় পৌনে চার লক্ষ কোটি টাকা হয় তাহলে দেশ যে আর্থিক দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে পড়বে তা তো বলাই বাহুল্য। আর এটা তো দেশকে বিক্রি করে দেওয়ারই নামান্তর। দেশদ্রোহী ও দুর্নীতিবাজ কংগ্রেস সরকার দেশটাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে, যার পথ প্রদর্শক দুর্নীতির পাহাড়ে বসে থাকা এক বিদেশিনী।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

ভাবনা-চিন্তা

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের কালব্যাধি ডেঙ্গি নয়, ধর্ষণ

পাঁচুগোপাল ঘোষ

সম্প্রতি বেশ কিছুদিন ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে প্রায় প্রতিটি সংবাদমাধ্যমেই ধর্ষণ কাণ্ড একটা কাগজের বেশ বড় অংশ জুড়ে প্রকাশ পাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে এর পরিমাণ কম হওয়ার পরিবর্তে ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তাই আমার মনে হয় আজ প্রায় সকল পশ্চিমবঙ্গের সমাজ সচেতক ব্যক্তিদের কাছে এটা একটা বড় চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন— "মেয়েদের পূজা করেই সব জাতি বড় হয়েছে। যে দেশে, যে জাতে মেয়েদের পূজা নেই, সে দেশ, সে জাত কখনও বড় হতে পারেনি, কস্মিনকালে পারবেও না"। এই ভবিষ্যতদ্রষ্টার সেই অমোঘ বাণী আজ পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে পূর্ণ মাত্রায় সফল হতে চলেছে।

আশ্চর্য হয়ে ভাবি যে তিনি এই পশ্চিমবাংলার বুকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আর আজ সেই পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা যে কোন অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে এটা তার জ্বলন্ত প্রমাণ। আজ সমস্ত যুব-সমাজ বলতে লজ্জা লাগে যে শিক্ষালাভ করে শুধুমাত্র পশুত্বে পরিণত হচ্ছে।

এ বিষয়ে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। নাহলে প্রতিদিন যেভাবে তারা তাদের ছোট ছোট অপ্রাপ্ত বয়স্ক বোনেদের প্রতি যৌন নির্যাতন চালাচ্ছে তা একমাত্র পশুপ্রবৃত্তিকেও হার মানায়। তাই বলি তারা আজ সরকারি অর্থে পুষ্ট রাশি রাশি দেশবাসীর টাকা অপচয় করে কি এই শিক্ষাই লাভ করেছে? যা তাদের অমানুষে পরিণত করছে। শিক্ষা সম্বন্ধে একটা প্রবাদ আছে যে, 'শিক্ষা আনে চেতনা'— তাহলে বলতে হয় যে এই কি যুবসমাজের শুভ চেতনা? যে চেতনা পশুত্বকেও হার মানায়। কোথায় তারা উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মা, বোনেদের সম্মান রক্ষা করবে। এখন দেখছি তারাই কিনা রক্ষকের ভূমিকা ছেড়ে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। এটা যে ভারতবর্ষের মতো একটি

সনাতনী ঐতিহ্যবাহী দেশের পক্ষে কতবড় লজ্জা তা বলা বাহুল্যমাত্র। এমন কি পশ্চিমী দেশগুলি যাদের আমরা যৌনতার লীলাভূমি বলে জানি সেখানেও এই ব্যভিচারের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা আছে। আর বর্তমানে আমাদের এই ভারতবর্ষে এই সব নরপশুদের অবাধ বিচরণভূমি। ভাবতেও শিউরে উঠতে হয় যে একজন নিষ্পাপ কন্যা শিশুর উপর যুবকের যৌন নির্যাতন ও পরে ধর্ষণ করে প্রমাণ লোপাটের জন্য তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে মারার চেষ্টা পশুত্বকেও হার মানায়। (উৎস : 'একদিন', ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১২ প্রথম পৃষ্ঠার হেড লাইন) এর শাস্তি বোধহয় প্রাণদণ্ড হলেও কম হয়। এর একমাত্র প্রতিকারের উপায় জনসমক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। তবেই সমাজদেহ হতে এই ধর্ষণব্যধি দেরিতে হলেও ক্রমে ক্রমে দূর করা সম্ভব। আর আমাদের প্রশাসন শুধু নীরব দর্শকমাত্র। পুলিশ বিভাগ দায়িত্বজ্ঞানহীন সরকার মুখাপেক্ষী। আর সাধারণ মানুষ স্থবির ও সুযোগ-সন্ধানী স্বার্থপর।

তা না হলে জনগণই এর তীব্র প্রতিবাদে মুখর হয়ে একজোট হয়ে সহজেই এর প্রতিকার করতে পারত। তাই বলি আর প্রশাসনের মুখাপেক্ষী না থেকে আসুন আমরা সকলে একজোট হয়ে এইসব নরপশুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। আর এখনই মা, বোনদের আগামীদিনে নিরাপত্তা দিয়ে এঁদের সম্মান রক্ষা করি। শুধু নিজেদের নিরাপত্তার সম্বন্ধে সচেতন না হয়ে সকলের নিরাপত্তার প্রতি যত্নবান হই। তাহলে এইসব নরপশুরা আর সমাজকে কলঙ্কিত করতে পারবে না। আমাদের আপামর জনগণের দুর্বলতা ও আত্মকেন্দ্রিকতাই এর জন্য দায়ী।

বড়ই দুঃখ লাগে যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা সেই রাজ্যই কিনা আজ মহিলা নির্যাতনে ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম স্থানে থাকে কি করে?

তাই মহামান্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট আমার বিশেষ অনুরোধ যে ডেঙ্গি নয়, ধর্ষণব্যধিই বর্তমান পশ্চিমবাংলার বড় ব্যধি। যা অচিরেই দূর করা দরকার। ডেঙ্গি মোকাবিলা ঔষধ ও উপযুক্ত পদক্ষেপে দূর করা সম্ভব হলেও, এই ধর্ষণ ব্যধি মনে হয় বর্তমান অবস্থায় পশ্চিমবাংলা থেকে দূর করা খুবই কঠিন।

জানি না আগামীদিনে এর প্রতিক্রিয়া পশ্চিমবাংলাকে ধ্বংসের কোন্ পথে পরিচালিত করবে।

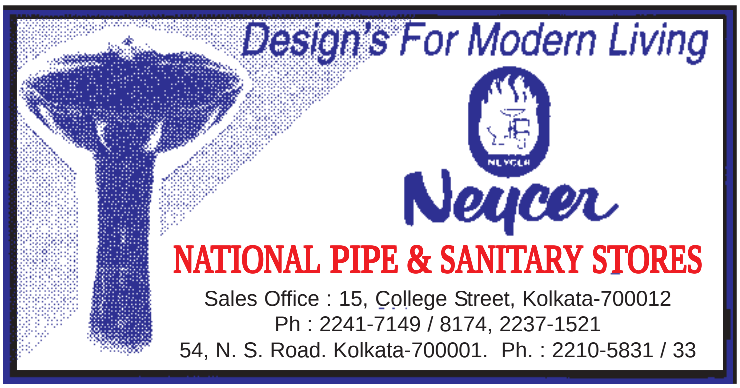

কেন জপ করবেন, কি ভাবে করবেন?

নবকুমার ভট্টাচার্য

জপ সমস্ত সাধনার অন্যতম প্রধান অঙ্গ। সাধারণ ভাবে বলা হয় জপ ছাড়া কোনও সাধনা হয় না। কেন না জপ না করলে মন্ত্রসিদ্ধি হয় না। আর জপ করতে হবে প্রতিদিন। মন্ত্রাক্ষরের বার বার আবৃত্তিকে জপ বলে। অর্থাৎ জপ বলতে বোঝায় শব্দ বাক্য বা মন্ত্রের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ। কিন্তু এই উচ্চারণ যান্ত্রিকভাবে উচ্চারণমাত্র নয় কারণ জপ শব্দ বাক্য বা মন্ত্রের অর্থভাবনাও বটে। কঙ্কালমালিনী তন্ত্রে বলা হয়েছে, কলিকালে একমাত্র জপই প্রশস্ত। জপের মাহাত্ম্য এবং গৌরব সনাতনধর্মী সব সম্প্রদায়েরই স্বীকৃত। জপ চিত্তের একাগ্রতা বা চিত্তস্থৈর্যের অন্যতম সর্বজনসাধ্য উপায়। জপ এবং যোগ সমার্থক। পাতঞ্জল যোগসূত্রানুসারে চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ। চিত্তস্থৈর্য বা চিত্তের একাগ্রতা এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধ একই বস্তু। কেননা কোনও এক অভীষ্ট বিষয়ে চিত্ত স্থির রাখার নামই চিত্তবৃত্তিনিরোধ। পাতঞ্জল্য যোগসূত্রের (১।২৮) ব্যাসভাষ্যে বলা হয়েছে, সাধ্যায় থেকে যোগারূঢ় হবে আবার যোগ থেকে স্বাধ্যায়ে আসবে। এই বাক্যটির ভাষ্যটীকায় বলা হয়েছে— স্বাধ্যায়ের বা অর্থের ভাবনাপূর্বক জপের দ্বারা যোগারূঢ় বা চিত্তকে একতান করবে। চিত্ত একাগ্র হলে জপ্য শব্দ বাক্য বা মন্ত্রের সূক্ষ্মতর অর্থের অধিগম হয়। সেই সূক্ষ্মতর অর্থ ভাবনাপূর্বক পুনরায় জপ করতে হয়। তৎপরে অধিকতর সূক্ষ্ম ও নির্মল ভাবাধিগম ও তৎপরে তা লক্ষ্য করে পুনরায় জপ। এরূপে স্বাধ্যায় হতে যোগ এবং যোগ হতে স্বাধ্যায় বিবর্দ্ধিত হয়ে প্রকৃষ্ট যোগকে নিষ্পাদিত করে।

জপ সকলের পক্ষেই সম্ভবপর। জাতি বর্ণ সকলের অধিকার। আর যে স্থানে চিত্ত প্রসন্ন হয় সেই স্থানে জপ করা উচিত। জপের কাল সম্বন্ধে নানা নিয়ম থাকলেও নিশীথে জপ করলে সে জপ অতিশয় ফলপ্রদ হয়। তবে সাধারণ ভাবে বলা হয়েছে ত্রিসন্ধ্যা জপ করতে। কেমন করে জপ করতে হবে সে প্রসঙ্গে মেরুতন্ত্রে বলা হয়েছে, অতি দ্রুত বা অতি বিলম্বিত জপ করতে নেই।

জপের অনেক প্রকারভেদ রয়েছে। তার মধ্যে বাহ্য ও আভ্যন্তর এই দুটি প্রধান। বাহ্য জপকে শাস্ত্রে বৈখরীজপ বলা হয়েছে। এটি প্রারম্ভিক ক্রিয়া। আভ্যন্তর জপের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এই জপ প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন, বাক্যের মধ্যমাভূমিতে যখন নাদের সঙ্গে মন্ত্র স্বভাবতঃ ধ্বনিত হয়ে উঠে তখন তা আভ্যন্তর জপ। শাস্ত্রমতে, ইন্দ্রিয়সমূহ সংযত করে আন্তর জপ করতে হয়। একেই বলে জপ। বাহ্য জপ, জপ নয়। জপের জন্য তিন প্রকারভেদও রয়েছে। যা ব্যক্ত, অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম। বাহ্য জপকে বাচিক, অব্যক্তকে উপাংশু আর সূক্ষ্মকে মানস বলে।

অন্যেও শুনতে পারে এরূপ ভাবে উচ্চারণ বাচিক জপ। দেবতাগত চিত্ত হয়ে জিহ্বা ও ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ চালনা করে অল্প শ্রবণযোগ্য করে বারবার উচ্চারণ করাকে বলে উপাংশু জপ। উপাংশু জপ কেবল নিজের কর্ণগোচর হবে। অর্থচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে উচ্চারণকে বলে মানস জপ। মানস জপ নিজের কর্ণগোচরও হয় না। মানস জপ একটি গূঢ় যোগসাধনার ব্যাপার। মানস জপের বিশেষত্ব এই যে এতে কোনও নিয়ম মানতে হয় না। পরমানন্দ তন্ত্রে বলা হয়েছে— মানস জপে অনন্তগুণ ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এই জপে কোনও নিয়ম নেই। চলতে চলতে শুয়ে বসে যেখানে সেখানে এই জপ চলে। এতে কোনও দোষ হয় না। কুলার্ণবতন্ত্রে বলা হয়েছে— বাচিক জপের চেয়ে উপাংশু জপ লক্ষ গুণ শ্রেষ্ঠ আর উপাংশু জপের চেয়ে মানস জপ কোটি গুণ শ্রেষ্ঠ। বাক্য, শব্দ বা মন্ত্রের অর্থ না জেনে জপ ভস্মে ঘি ঢালা। অর্থজ্ঞানহীন জপ সফল হয় না। বাক্য, শব্দ বা মন্ত্রের অর্থ পুরোপুরি জেনে এবং তন্নিষ্ঠ তদ্‌গতপ্রাণ, তৎপরায়ণ হয়ে জপ করতে হয়। তবেই জপের ফল মিলবে।

জপের মধ্যে অজপাজপ অন্য জপ থেকে ভিন্ন। এটি জপহীন জপ। বাহ্য আকাশে বায়ুতরঙ্গে যেমন শব্দ ওঠে তেমনি মানুষের দেহাভ্যন্তরস্থ আকাশেও প্রাণবায়ুতরঙ্গে শব্দ ওঠে। মানুষের নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের সঙ্গে এই শব্দটি অবিরত উচ্চারিত হচ্ছে। একেই বলে 'হংস' মন্ত্র বা অজপা মন্ত্র। এই মন্ত্র জপের জন্য ইচ্ছা বা যত্ন না করলেও আপনা থেকেই জপ হয় বলে একে অজপা বলা হয়। হংস স্বয়ং ভগবতী। ইনি মহাশক্তি কুলকুণ্ডলিনী। শিব ও শক্তি অভিন্ন। হংস মন্ত্রেও সেই অভেদসম্বন্ধ রয়েছে। হংস = হং > শিব + সঃ > শক্তি। অজপা চলে মৃত্যু পর্যন্ত। এই জপ যোগীদের জপ।

এই জপ গুরুর কাছে শিখতে হয়। গ্রন্থপাঠ করে এ সম্বন্ধে পরিস্কার করে কিছু জানা কঠিন। এই জপ যোগীদের মোক্ষদায়িণী। প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রাণবায়ুকে আয়ত্ত করে মন স্থির করতে পারলে তবেই সাধকের অজপা জপ হয়। অজপা জপও স্বতঃই অবিরত চলছে। তার স্বরূপ জেনে তার সঙ্গে মনকে যুদ্ধ করতে পারলে, তাতে মনকে তন্ময় করলে তবেই অজপাজপ সাধন হবে।

কলিকালে জপযজ্ঞের চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নেই। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষের সাধনা একমাত্র জপের মাধ্যমেই হতে পারে। কুলার্ণব তন্ত্রের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে— জন্মান্তর সহস্রের কৃতপাপ নাশ করে এবং পরদেবতার প্রকাশ করে বলে জপকে জপ বলা হয়েছে।

পৌরাণিক নগর উশীনর

গোপাল চক্রবর্তী

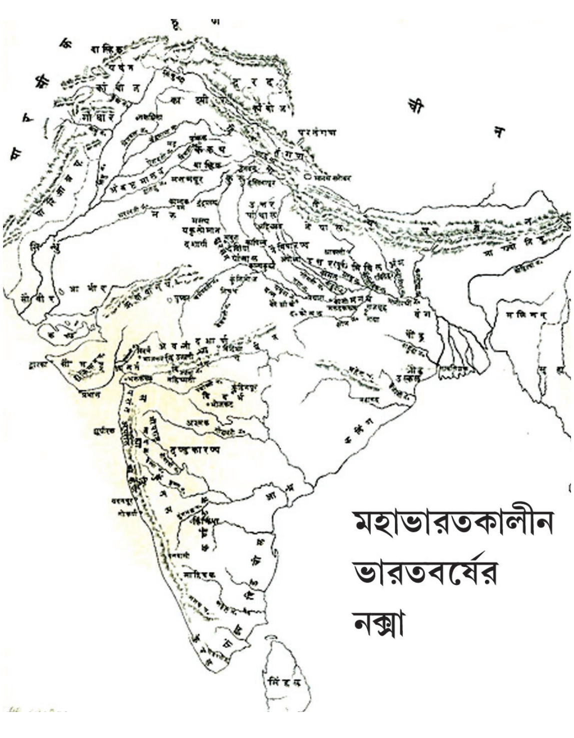

মহাভারতকালীন ভারতবর্ষের নক্সা

ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুযায়ী উশীনর মধ্যদেশে অবস্থিত কুরু-পাঞ্চালের নিকট অবস্থিত জনপদ।

“অস্যাং ধ্রুবায়াং মধ্যমায়াং প্রতিষ্ঠায়াম্ দিশি।”

কৌষীতকি উপনিষদেও উশীনরদের মৎস্য, কুরুপাঞ্চাল এবং বশদের (পরবর্তীকালে বৎস) সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। সম্ভবত তারা মধ্যদেশের সুদূর উত্তরে বাস করত। কারণ, গোপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় উদীচ্য বা উত্তরবাসীদের ঠিক পূর্বে উশীনর এবং বশদের উল্লেখ আছে—

“কুরু পাঞ্চালেষু অঙ্গ-মগধেষু
কাসি-কৌসল্যেষু শ্বাল্ব-মৎস্যেষু
সা বশ উশীনরেষু উদীচেষু।”

—মহাভারতে উল্লেখ আছে উশীনর যমুনার নিকটবর্তী দু'টো ছোটো স্রোতস্বিনীর তীরে যাগ-যজ্ঞাদি করেছিলেন। ‘কথাসরিৎসাগর’-এ উশীনর গিরিকে কনখলের নিকটবর্তী পুণ্যতীর্থভূমি যেখানে গঙ্গানদী পর্বত থেকে বেরিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে উশীনর পর্বত দিব্যাবদানের ‘উশীনরগিরি’ এবং বিনয়পিটকের ‘উসিরধ্বজ’- এর সঙ্গে এক এবং অভিন্ন। পাণিনি তাঁর অনেক সূত্রেই উশীনর অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন।

পরম্পরা

ঋগ্বেদে উশীনরাণী নামে এক রাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাভারত অণুক্রমণী ও অন্যান্য বহু জাতক থেকে উশীনর নামে এক রাজা ও তাঁর পুত্র শিবির কথা জানা যায়। সম্ভবত বৈদিক যুগেও ‘উশীনর’ নামে পৌরাণিক নগরটির অস্তিত্ব ছিল এবং এখানে ‘উশীনর’ নামে এক গোষ্ঠীর বাস ছিল। অনেক পণ্ডিত অনুমান করেন যে পরবর্তীকালের কাশী ও বিদেহবাসী গোষ্ঠী এদেরেই বংশধর। পুরাণের বংশাবলীতে বর্ণিত আছে যে চন্দ্রবংশীয় ‘আনব’ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত উশীনর নামক নৃপতি পাঞ্জাবে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই রাজ্য তাঁর পাঁচ পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হয়। সুলতানের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন ‘শিবি’; বর্তমান পাকিস্তানের মন্টগোমারি জেলা এবং বিকানীর জেলার উত্তরাংশ নিয়ে ‘নৃগ’ একটি পৃথক রাজ্য স্থাপন করেন। যৌধেয়গণ এই বংশ থেকে উদ্ভূত। ‘নব’ নবরাষ্ট্রের এবং ‘কৃমি’ কৃমিলা নগরের অধিপতিগণের পূর্বপুরুষ। ‘সুব্রত’ সম্ভবত পূর্ব পাঞ্জাবের অম্বষ্ঠগণের আদিপুরুষ। উশীনরের পুত্রগণের মধ্যে শিবিই সর্বাধিক প্রসিদ্ধিলাভ করেন এবং তিনিই শিবিগোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। *The History and Culture of the Indian People*– *R.C. Majumder.*
২। *প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস— ড. হেরম্ভচন্দ্র রায় চৌধুরী।*
৩। *ভারত কোষ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।*

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী

(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩

ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

দাঁতনে মোঘলমারি গ্রামে বুদ্ধ-বিহার

ভোলানাথ নন্দী ॥ গত ১৭ অক্টোবর মেদিনীপুর ফিল্ম সোসাইটির সভাগৃহে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থেকে ৪ কিমি দূরে আবিষ্কৃত মোঘলমারি গ্রামে বৌদ্ধ-বিহার সম্পর্কে একটি পনেরো মিনিটের তথ্যচিত্র দেখানো হয়। এটি তৈরি করেছেন ফিল্ম সোসাইটির সদস্য সৌমেন্দু দে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য রঞ্জন চক্রবর্তী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা সম্পাদক রজত কুমার সাইনি।

দাঁতন থানার দাঁতন-১ নং ব্লকের অন্তর্গত গ্রাম মোঘলমারি, মৌজা-সিমুলিয়া (উত্তর), জে. এল. নং-৭৩। এই বৌদ্ধ-বিহার আবিষ্কর্তা ডঃ অশোক দত্তের মতে, বৌদ্ধ-বিহারটি পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত অন্যান্য বৌদ্ধ-বিহারগুলির তুলনায় বৃহত্তম এবং উৎকৃষ্টতম অলঙ্করণসমৃদ্ধ। এখনও পর্যন্ত এই বিহারের কোনও নামফলক আবিষ্কৃত হয়নি। বিহারটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সম্ভবত পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে। এটি দশম-একাদশ শতক পর্যন্ত কার্যকর ছিল বলে মনে হয়।

অনুষ্ঠানে দাঁতন থেকে প্রকাশিত এবং 'সায়ক' পত্রিকার 'মোঘলমারির বৌদ্ধবিহার সংক্রান্ত' বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন সম্পাদক সূর্য নন্দী। ১৯৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত এই বিশেষ সংখ্যায় ২০০৪ সালে খননকার্য শুরু থেকে আজ পর্যন্ত প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

আগ্রহী পাঠক ও উৎসাহী পর্যবেক্ষকরা এটি সংগ্রহে রাখতে পারেন। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই উৎখনন কার্যের প্রেরণাপুরুষ ডঃ অশোক দত্ত গত ৩১ জুলাই প্রয়াত হয়েছেন।

শেষ পর্যায়ের খননের (৪ মে— ২৩ মে, ২০১২) পর খননকারী দলটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে— (১) বৌদ্ধ বিহারটির উত্তর ও পশ্চিমাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল বা বিভিন্ন সময়ে এই অংশ থেকে প্রচুর ইঁট লুঠ করা হয়েছিল। ফলে দফায় দফায় বিহারটি পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার করতে হয়েছিল।

(২) প্রথম নির্মাণ ধ্বংসের বেশ কিছু বছর পর নবম-দশম শতাব্দীতে সেই ধ্বংসাবশেষের উপর বৃহদায়তনে দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্মাণ সংগঠিত হয়েছিল। এই নির্মাণশৈলী দক্ষতাপূর্ণ ছিল না। এমনকি শক্তপোক্ত দেওয়ালটিতে চুনের পলেস্তারা বা স্টাকোর অলংকরণ ছিল না। তবে এই নির্মাণ-শিল্পীরা আলোর স্টাকো শৈলীগুলি নষ্ট করেননি। তার কারণ এই নির্মাণকারীরাও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন।

এখনও বিহারটির কোনও নামমুদ্রা পাওয়া যায়নি। আরও ব্যাপক ও নিবিড় উৎখনন এবং পর্যবেক্ষণই এই বিহারটির সম্পূর্ণ পরিকল্পনা সম্পর্কে পরিপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করতে পারে।

চিত্র পরিচিতি : মোঘলমারি গ্রামে বুদ্ধ-বিহারের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

নবাঙ্কুর

হোতু-কোতু উপাখ্যান

ছোটোদের সঙ্গে একদিন

উৎসব শেষে ছোটোদের খাওয়ানোর ভাবনাটা হোতুর। সবাই জড়ো হয়ে একসঙ্গে খাওয়ার আনন্দ অন্যরকম। অনেকেই উৎসাহ দেখিয়েছিল। হোতু অনেকটা খরচ সামলেছে। সে অন্যদের বলেছে,‘তোমরা কিছু দিও। যার যতটুকু ইচ্ছে কিংবা সামর্থ্য। তাতে সকলেরই ভূমিকা থাকবে। নয়তো কেউ কেউ ভাবতে পারে, ‘ওসব হোতুর ব্যাপার।’ ‘আমাদের নয়। আমি সবসময় বলেছি সবাই মিলে কাজ।’ হোতুর কথাকে সমর্থন করে সকলে। কোতুকে বলেছিল হোতু, ‘প্রত্যেকের নাম লিখে রাখবে। কে কোন্ জিনিস দিল। সকলের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে।’ একেকজন এক একটা জিনিসের দায়িত্ব নেওয়ায় সব এগিয়ে গেল স্বাভাবিক গতিতে। হোতু বলে দিয়েছিল, ‘যে যা দিতে চায় সব নেবে ঠিকই। তবে কোনও খারাপ জিনিস নেবে না। যে দিতে চায় তার দায়িত্ব আছে এটা মনে রেখে সম্মান জানাবে।’

রামরতন যাদব দুরকমের ডাল দিয়েছে চল্লিশ কিলোগ্রাম। চাল এসেছে ষাট কিলোগ্রাম। আনাজপত্র একেকজন দিয়েছিল। নিরামিষ খাবার। তবে যত্নে রাঁধা, দেওয়া, খাওয়া হবে। চারজন রান্নার লোক চিকলি আনবে ঠিক করেছিল। পয়সা নিয়ে কাজ করবে। হোতু জেনে নিয়েছিল রান্নার কাজে সুনাম আছে তাদের। বাসনপত্র ভাড়া করা হলো শেঠ ডেকরেটার্স থেকে। ওরা ক্যাটারিং ব্যবসাও করে। অনিল শেঠ বলল, ‘টাকা লাগবে না। এক পিঠের ভাড়া দেবে তোমরা। বাসনপত্র ধুয়ে নেবে ধুয়ে দেবে।’ রান্নার লোকরা বাসন ধুয়ে দেবে বলেছে। হোতু বলেছে, ‘ছোটোরা খাবে। সব কাজ যত্নে করা চাই।’ কমল ঠাকুররা বলেছে, ‘আমাদের উপর ভরসা করতে পারেন।’

উৎসবের জন্যে চেয়ার টেবিল এসেছিল। কোতু বলল, ‘হোতুদা, বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়ে থাকবে। চেয়ার টেবিলে বসে খেতে অসুবিধে হবে তাদের। দু’ সারিতে মেঝেতে বসালে সুবিধে।’ হোতু বলল, ‘ঠিক আছে।’ পবন রায় বলল, ‘আমি নতুন লম্বা সতরঞ্চি আর চাদর দেবো।’ পাতায় খাওয়ানো হবে না প্লেটে? এই ভাবনাটা এলো। গগন দাস বলল, ‘কলাপাতা, মাটির গ্লাস চমৎকার হবে।’ তাই ঠিক হলো সকলে রাজি হওয়ায়। গগনের প্রসন্ন মুখের দিকে তাকাতেই সে হাত তুলে ঘাড় নেড়ে বোঝাল, ‘আমি দায়িত্বটা নিলাম।’

হোতু পনেরোজন তরুণকে বেছে নিয়েছিল ওইদিন কাজের জন্যে। যারা পরিশ্রমী, হাসিখুশি, ভালো ব্যবহার। ছোটোদের দিকে লক্ষ্য রাখবে তারা। কাউকে বকাঝকা নয়। সুশৃঙ্খলভাবে সবকিছু হবে। ছোটোদের খাওয়ানো শেষ হলে বড়োরা খাবে। খুব ছোটোরা যদি নিজেরা খেতে না পারে তাহলে খাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হবে। গরিব ছেলেমেয়েদের কথা ভাবা হলেও স্টেশনারি দোকানের মালিক অখিল মুখোপাধ্যায় বললেন, ‘আমাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরাও খাবে।’ হোতু বলল, ‘অখিলদা, এতো ভালো প্রস্তাব।’ অখিল বললেন, ‘খাওয়ার পরে ছোটোদের দুটো করে খাতা আর একটা পেন আমি দেবো।’ হোতু হাত বাড়িয়ে দিল অখিলের দিকে। আয়োজনে অনেক কিছু যোগ হচ্ছে বলে হোতুর চিন্তা বেশি! সব ঠিকঠাক হবে সকলে মিলে— এটা মানে হোতু।

খুব ভালো খিচুড়ি, তিনরকম ভাজা, একটা তরকারি, চাটনি, পাঁপড় আর বোঁদে। রাজেন ঘোষদের দালানবাড়িতে সব আয়োজন। কোনওরকম বাড়তি হইচই নেই! সব কাজ এগিয়ে চলল ঠিকভাবে। হোতুর ডাকে সকলে এসেছে। সে বলেছিল প্রত্যেককে, ‘থাকতে হবে। দেখতে হবে। খেতে হবে।’ ছোটোরা যাতে আনন্দ পায় সেটা দেখার ব্যবস্থা ছিল। বেলুনটেলুন দিয়ে ছোটোদের মনের মতো করে সাজিয়েছিল অনির্বাণ রায় আর দীপায়ন ঘোষ। দুজনেই আর্ট কলেজের ছাত্র। হোতুর সঙ্গে ভালো পরিচয়। কোতু বলেছিল, ‘আস্তে আস্তে ছোটোদের কিছু গান বাজানো যায় কি?’ হোতু রাজি হয়েছিল। সব মিলিয়ে জমে উঠল। ছোটোরা আনন্দ পেয়েছে যথেষ্ট। বড়োরাও। কোনও জিনিস কম পড়েনি। কোথাও কোনও অসুবিধে হয়নি। সকলে মিলে কাজ করার মজাটা কেমন তা দেখে কেউ কেউ বলেছে, ‘প্রতি বছর এরকম হওয়া চাই।’

অর্জুন রায় ছবি তুলেছে অনেক। হোতু তাকে বলল, ‘অনেক ছবি তুলেছো। এবার খেয়ে নাও।’

অর্জুন ততক্ষণে ক্যামরা তাক করেছে হোতুর দিকে! হোতুর প্রসন্ন মুখের ছবি সে ধরে রাখতে চায়।

কৌশিক গুহ

বই কথা কই

বইয়ের যত্ন করতে শেখা

রোজই কিছু-না-কিছু বই পড়ে টুম্পা। বইয়ের কোনওরকম যত্ন তার নেই। ছোটোবেলা থেকে অনেক বলা হয়েছে। কিন্তু অভ্যেস গড়ে ওঠেনি। বই এলোমেলো রাখলে নিজের খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়। বাড়ির আলমারির বই ঠিকভাবে সাজানো বিভিন্ন তাকে। নেওয়ার পর যেখানে যেখানে রেখে দিলে সকলেরই অসুবিধে। দেখতেও ভালো লাগে না।

টুম্পার মাসতুতো বোন রিম্পার বইয়ের তাক ঝকঝকে। সবকিছু সাজানো। শুধু সাজিয়ে রাখা নয়, ব্যবহারের জন্যে। কাজ করার পর ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে রাখার অভ্যেস তৈরি হয়ে গেছে। কোথাও এলোমেলো কোনও বই নেই। রিম্পার ঠাকুমা সবদিকে নজর রাখেন। কোনওসময় রিম্পা একটা বই পড়ার পর আলমারির যে-কোনও তাকে রাখলে ঠাকুমা সঙ্গে সঙ্গে বলেন, 'ঠিক জায়গায় রাখো।' এভাবেই অভ্যেস তৈরি হয়ে গেছে।

রিয়ার বাবা বলেন, 'বইপত্র ঠিকভাবে গুছিয়ে রাখলে দেখতে ভালো লাগে। দরকারের সময় পাওয়ার জন্যে হিমসিম খেতে হয় না। আর অভ্যেস গড়ে উঠলে কোনও অসুবিধে হবে না। লাইব্রেরিতে বই তাক থেকে নিয়ে ঠিক জায়গায় রাখলে দেখতেও ভালো লাগে। কাজেরও সুবিধে।'

রিয়ার দাদু বলেন, 'রান্নাঘরে এক এক জায়গায় এক একটা জিনিস থাকে। এলোমেলো রাখলে অসুবিধে হবে রান্নার সময় কিংবা খাবার দেওয়ার সময়। বই সাজানো থাকলে তা বাড়ির সেরা আসবাব হয়ে ওঠে। অবশ্যই বই পড়াও চাই।'

টুম্পা এখন বইয়ের যত্ন করছে।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. সঙ্গীতের তিনটি শাখার নাম?

২. কোন্ কোন্ বাদ্যযন্ত্র বাজাতে আঙুল ছাড়া অন্য অঙ্গের প্রয়োজন?

৩. সঙ্গীতের আদিগুরু কাকে বলা হয় (প্রচলিত মতে)? তাঁর কাছে কে শেখেন?

৪. গভীর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত কোন্ কোন্ রাগের সময়?

৫. ছড়ি বা ছড় দিয়ে কি কি যন্ত্র বাজানো হয়?

উত্তর : ১. গীত, বাদ্য, নৃত্য। ২. বাঁশি, সানাই। ফুঁ দিতে হয় মুখে। ৩. ব্রহ্মা (চতুরানন ব্রহ্মা নন)। মহাদেব। ৪. কাফী বাগেশ্রী, বাহার দরবারি কানাড়া, মালকোষ, ভূপালি, টোড়ি প্রভৃতি। ৫. বেহালা, সারেঙ্গী, এস্রাজ।

ছোটোদের বলছি

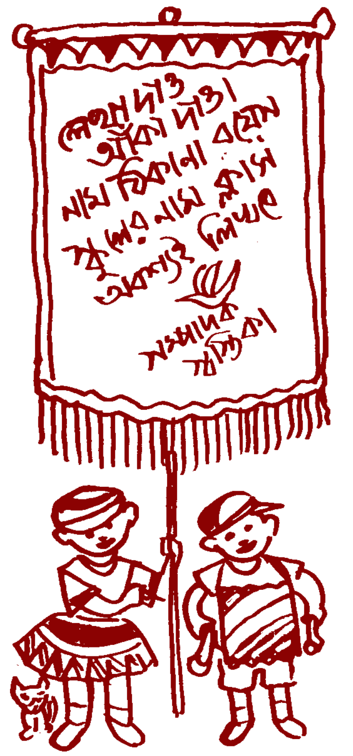

উলটো পালটা

সায়ন ক্লাস ওয়ানে পড়ে। হাসিখুশি খুব ভালো ছেলে। বেশ চটপটে। স্কুলে স্যার কোনও প্রশ্ন করলে ঝটপট জবাব দেয়। সেদিন স্যার জিগ্গেস করলেন, 'অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার কে?' সায়নের ঝটিতি জবাব, 'যিনি হেড স্যারের পিছন পিছন ঘোরেন।'

২

দীপেনের প্রিয় শখ ঘুমোন। দিনের অনেকটা সময় তার ঘুমিয়ে কাটে। সকালে দশটার আগে ঘুম ভাঙে না। অনেকবার ডেকে তুলতে হয়। কেউ কেউ বলে 'কুম্ভকর্ণের ছোট ভাই'। দীপেন পাত্তা দেয় না। কোনও কাজ করতে গেলে ঘুমিয়ে নেয়। কতদিন বাসে যেতে যেতে নির্দিষ্ট স্টপে নামতে ভুলে গেছে ঘুমিয়ে পড়ায়। স্কুলে পড়ার সময় ঘুম পায় না। খেলার সময়েও নয়। বাড়িতে পড়া শেষ করে ঘুমোয়। খাওয়ার জন্যে মা-জেঠিমা অনেকবার ডেকে তোলে। খাওয়ার পর ঘুম চাই। সকালে বেড়ানো পড়া কিংবা গানচর্চা কোনটাই করতে চায় না।

একদিন বাড়ির সকলে দলবেঁধে বেড়াতে গেছে মামার বাড়ি। সাতসকালে ঘুম থেকে উঠতে

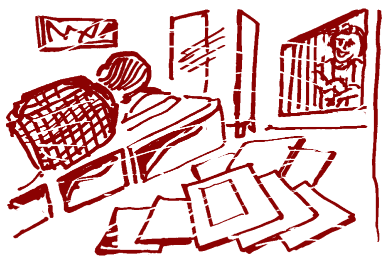

হয়েছে দীপেনকে। মামার বাড়িতে গিয়ে শুধু মনে হচ্ছিল কি একটা কাজ হয়নি। মনে পড়ল তার, ও ঘুমোন হয়নি। একটা ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুম। দুপুরে খাওয়ার সময় খোঁজ পড়ল দীপেনের। ধারেকাছে কোথাও নেই। সকলের দুশ্চিন্তা বাড়ল। দীপেনের মাসতুতো বোন সোমা বলল, 'চিলেকোঠার ঘরটা একবার দেখো তো।' ঠিক তাই। দরজায় ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙাতে হলো। দীপেন বলল, 'বাড়িতে ফেরার সময় ডাকলেই পারতিস।' সোমা বলল, 'কোনও কথা না বলে নিচে গিয়ে খাবার খা। আমার মা আর তোর মায়ের তো মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।'

বীরাঙ্গনা রাণী রাসমণি

বিদিশা ভট্টাচার্য

রাসমণি ছিলেন ভক্তিপ্রাণা প্রজাবৎসল বিনম্র স্বভাবের এক মহীয়সী নারী। ১৭৯০ সালে ২৬ সেপ্টেম্বর হালিশহরের কোনা গ্রামে দরিদ্র এক চাষীর ঘরে জন্ম। তিনি ইংরেজ আমলেও কতটা তেজস্বিনী ছিলেন তার প্রমাণ মেলে ইতিহাসের পাতায়। এক দরিদ্র কৃষকের মেয়ে হয়েও তিনি বিত্ত ও প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সাহস ও শক্তি সত্যিই তুলনাতীত। তাঁর মহাপ্রয়াণের সার্ধশতবর্ষে মহাপ্রাণা'র প্রতি রইল বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য।

লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালের সমাপ্তিই ছিল রাসমণির জন্মকাল। রাসমণির জীবন শুরু হয়েছিল গ্রামের এক কৃষক পরিবারে, কিন্তু বিবাহের ফলে তিনি এসে উঠেছিলেন কলকাতার প্রভাবশালী এক ব্যবসায়ী পরিবারে। তিনি আধুনিক যুগে বিচরণ করলেও হিন্দু সংস্কার থেকে একটুও সরে যাননি।

রাসমণি ছিলেন ঐশ্বর্যভূষিতা ও জনগণের মঙ্গলকারিণী। জানবাজারের বাড়িতে দোল-দুর্গোৎসব লেগেই থাকত। আর সেসব অনুষ্ঠানে সাধারণ মানুষের প্রবেশ ছিল অবারিত। তার উল্লেখ্য নিদর্শন হলো 'রথযাত্রা'। তিনি ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রূপোর রথ বানিয়েছিলেন। কয়েক মাসের পরিশ্রমে অনেকজন কারিগর মিলে কাঠের চাকাওয়ালা রথ তৈরি হলো। সেই সময় চারিদিকে হিন্দুধর্মের কুৎসা রটিয়ে বেড়াচ্ছিল ইয়ং-বেঙ্গল। হীনম্মন্যতায় আচ্ছন্ন জাতির মনে আত্মবিশ্বাস জাগানো, নিজেদের ধর্ম ও সমাজের জন্য গৌরববোধ উদ্বুদ্ধ করার জন্য রথযাত্রা উৎসব ছিল তাঁর প্রকাশ্য পদক্ষেপ। রথের সামনে ও পিছনে ঢাকঢোল, সানাই, কাড়া, নাকড়া, বাঁশি, জগঝম্প বাজছে, কীর্তনিয়ারা গান গাইছিল। নগরীর মানুষের ভীড় উপচে পড়েছিল রথের দু'ধারে।

এতেই শেষ নয়। গরীব প্রজাদের পাশেও তিনি দাঁড়িয়েছেন। তাঁর মকিমপুর পরগণায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল। কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে নীলচাষে বাধ্য করেছিল। রাণীর কাছে কৃষকদের আবেদনে ৫০ জন লাঠিয়াল পাঠানো হলো। সব নীলকরকে তাঁর জমিদারির এলাকা থেকে উচ্ছেদ করা হলো। তিনি তাঁর প্রজাদের নির্দেশ দিলেন, কেউ যেন কোনও কারণেই নীলকরদের টাকা না দেয়, জমি না দেয়। এইভাবে নীলচাষ বন্ধ করা হলো। তিনি হয়ে উঠলেন গ্রামের দুঃখী-দরিদ্র মানুষের 'রাণীমা'।

সরকার একবার আইন করল, জেলেরা যদি গঙ্গায় মাছ ধরে তাহলে জলকর দিতে হবে। প্রতিবাদ করার সাহস কোনও গরীব চাষির ছিল

না। রাণী সরকারের কাছ থেকে গঙ্গার সেই অংশটুকু ইজারা নিলেন যেখানে জেলেরা মাছ ধরতে পারত। সরকার জেলেদের ওপর থেকে জলকর প্রত্যাহার করে নিল। রাসমণিকে ১০ হাজার টাকা ফেরত দিল। রাণীর জয়, প্রজাদের জয়, একসঙ্গে মিশে গেল। রাইটার্স বিল্ডিংস, ফোর্ট উইলিয়ামের কাছ দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গার অধিকার নিয়েই ঘটেছিল সরকারের পরাজয়। ধন্য ধন্য পড়ে গেল চারিদিকে।

জানবাজারের বাড়িতে প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব হোত। রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যুর পর রাসমণি দুর্গাপুজোর ধুমধাম আরও বাড়িয়ে দিলেন। একবার ষষ্ঠীর দিন ব্রাহ্মণরা বহু লোকজন সঙ্গে নিয়ে, ঢাকঢোল বাজিয়ে গঙ্গায় একাত্রিকা স্নান করানোর জন্য জানবাজারের বাড়ি থেকে বাবু রোড দিয়ে বাবুঘাটের দিকে যাচ্ছিলেন। ভোরবেলা, তাই বাবু রোডের ধারের এক বাড়ির ইংরেজ সাহেবের ঘুম ভেঙে গেল ঢাকঢোলের আওয়াজে। তিনি বন্ধ করার আদেশ দিলেন, রাণীর কাছে খবর যাওয়ায় তিনি আরও জোরে বাজাতে বললেন, নাচ হবে, গান হবে সাহেবদের তোয়াক্কা না রেখেই। সাহেব এই অপমান সহ্য করেননি। তিনি সরকারের কাছে নালিশ জানালেন। কিন্তু রাণী জবাব দিলেন— ''জায়গা আমার, রাস্তা তৈরিও করেছি আমি। সরকারের যদি বেশি গরজ থাকে তাহলে উচিত মূল্য দিলে ছেড়ে দেব রাস্তা।'' ভারত সরকার, কলকাতাতেই যাদের প্রধান কার্যালয় তারা নিজেদের হুকুম তো প্রত্যাহার করলই উপরন্তু রাণীর কাছে কাকুতি মিনতি জানাতে থাকল, তারা রাণীর জরিমানার টাকাও ফেরত দিল।

রাণীর সমস্ত কীর্তিকে ছাপিয়ে গিয়েছিল এই দক্ষিণেশ্বর মন্দির। স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর রাণীর জীবনধারাও পাল্টে গিয়েছিল। তাঁর কর্ম সবই বজায় ছিল, দায়িত্ববোধে তিনি সর্বদাই ন্যস্ত ছিলেন। আপন গৃহের নিভৃতিতে তিনি বরণ করেছিলেন তপস্যার জীবন। সেকালে ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জমি কেনা, মন্দির নির্মাণ করা, গঙ্গার পাড় বাঁধানো এসব কাজে তাঁর লেগেছিল ৮/৯ বছর। এই মন্দির প্রতিষ্ঠাতেও রাণী প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। সে বাধা এসেছিল। দেশের ব্রাহ্মণ সমাজের কাছ থেকে। কিন্তু একজন ব্রাহ্মণই সেই বাধা অতিক্রম করতে রাণীকে সাহায্য করেছিলেন। তিনি হলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়। রামকুমার শুধু বাধাই দূর করলেন তাই নয়--- তিনি নিজে পুরোহিত হয়ে, দেবীপূজার দায়িত্ব নেন। তাঁর সবচেয়ে বড় দান হলো--- শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস। মন্দির প্রতিষ্ঠার সমারোহের দিনেই শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন অত উৎসব, জাঁকজমক, লোকারণ্য, আলো, বাজি, বাদ্য, গান— সেসবের মধ্যে চুপ করে, আপন মনে দাঁড়িয়েছিল ১৯ বছরের যুবক গদাধর (রামকৃষ্ণ)। রাসমণির প্রয়াণের পর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন--- ''রাণীরাসমণি শ্রীশ্রী জগদম্বার অষ্ট নায়িকার একজন, ধরাধামে তাঁহার পূজা প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন।'' এক সাধারণ দরিদ্র পরিবারে জন্মেও এত সাহস, এত শক্তি, এত পৌরুষ, এত ভক্তি অর্জন কীভাবে করেছিলেন রাসমণি? এই প্রশ্নের শেষ উত্তর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মর্মকাহিনীতেই লেখা হয়ে আছে। মহাশক্তির প্রতিনিধি হয়ে তিনি জগতে এসেছিলেন। লীলা বিস্তারে সহায়তা করতে, শক্তির বোধ সর্বদা ছিল তাঁর চেতনায়। জীবনে কখনও হার মানেননি তিনি। বিজয় ছিল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে। তাঁর সময়ের মহানরাও কোথায় হারিয়ে গিয়েছেন। রাসমণিকে কেউ ভোলেননি, ভুলবেনও না। এই বীরাঙ্গনা নারী সমাজের সকল অঙ্গনার আদর্শ।

তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন ১৮৬১ খৃস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারি।

গীতসুধারসে এসো

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বঙ্গের সঙ্গীতজগতে ব্যান্ড-সংস্কৃতির ধারায় মুক্তবেড়ি ব্যান্ডের নামটা চেনা চেনা মনে হচ্ছে? অবশ্য নামটা খুব পরিচিত নয়। তবে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত অভিনীত মুক্তধারা ছবিটা যাঁরা দেখেছেন, তাঁদের কাছে মুক্তবেড়ি ব্যান্ডের নামটা খুব অপরিচিত নয়। ওই ছবিতে এদের পারফরম্যান্স তো ছিলই, এমনকী ছবির কিছু অংশও এদের কাহিনী-নির্ভর। হ্যাঁ কাহিনী-ই বটে। আর পাঁচটা সঙ্গীত ব্যান্ডের মতো সাধারণ নয় মুক্তবেরী। আট সদস্যের এই ব্যান্ডের সদস্যরা হলেন সুজিত দলুই, শান্তনু বাগদী, পরিমেশ অপালি, স্বপন বারুই, সহদেব সরকার, গিরিধারী কুমার, পরিতোষ ঘোষ, মানিককুমার ও স্বপন সর্দার। এঁরা প্রত্যেকেই সাজাপ্রাপ্ত কারাবন্দী। ঠিকই শুনছেন, সাধারণ মানুষের চোখে এঁরা আসামী বই আর কিছু নন। কিন্তু এরই মধ্যে জেলের সংশোধনাগার নাম কে সার্থক করে তুলে এঁরা ঘটিয়ে ফেলেছেন এক অসামান্য কাজ। এর মধ্যে একমাত্র শান্তনু বাগদী-ই ছাড়া পেয়েছেন। বাকিদের ঠিকানা আপাতত কলকাতার উপকণ্ঠে দমদম সেন্ট্রাল জেল। ছিলেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে। কেউ মুর্শিদাবাদের বহরমপুর জেলে, কেউ পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর জেলে, কেউ বা উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ জেলে, কেউ আবার কলকাতার দমদম কিংবা আলিপুর জেলে। এঁরা একত্র হয়েছেন গানের টানে। বছর দু'য়েক আগে রাজ্য সংশোধনাগারের আই জি (কারা) রণবীর কুমার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন এই ব্যান্ডের। তাঁর মনে হয়েছে, এই মিউজিক থেরাপি সংশোধনাগারে থাকা একদা অপরাধী মানুষের আধ্যাত্মিক চেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। কিছুদিন আগে মুক্তবেরীর প্রথম মিউজিক অ্যালবাম 'ওরে মানুষ' রিলিজ করেছে। সাড়া আপাতত ভালোই। তাই স্রেফ সংশোধনাগারেই নয়, রবীন্দ্রসদন কিংবা নন্দনের 'শো' করতে চান তাঁরা। এঁদের গানগুলো মূলতঃ লোকসঙ্গীত। 'ওরে মানুষ'-এ অনুচ্চারিত কণ্ঠে বলা রয়েছে এঁদের জীবনে কীভাবে অপরাধ এসেছে এবং তারপর সেই আতঙ্কগ্রস্ত দিনের কীভাবে সাক্ষী রইলেন এঁরা। অতীতকে সঙ্গে করেই তাই এগিয়ে চালার শপথ নিয়েছে মুক্তবেরী।

মুক্তবেড়ি ব্যাণ্ডের সদস্যরা সঙ্গীতে মগ্ন।

খুচরো ব্যবসায়ে প্রত্যক্ষ পুঁজি নিয়ে ভোট নয় কেন?

অতিথি কলম

অরুণ জেটলি

সারাদেশ জুড়ে এক প্রাসঙ্গিক সংশয় ছড়িয়ে রয়েছে। এর মূল কারণ হলো যে, সরকারের সঙ্গে বিরোধীদের রাজনৈতিক আলাপ- আলোচনায় অবস্থা প্রায় ভেঙেই পড়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে ঐক্যমত্য সম্ভব এবং ক্ষেত্র বিশেষে তা সময়ের নিরিখে জরুরিও। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি যা, তা হলো সরকার গোঁজামিল দিয়ে দেশ চালাতে চাইছে এবং

"সংস্কারের অপব্যাখ্যা করছে সরকার। 'সংস্কারে'র প্রতিশব্দ হলো সম্ভাবনাকে সুচারুরূপে রূপদান করা। সংস্কার যদি জনবিরোধী হয় এবং তার পরিণাম শুধু দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, রান্নার গ্যাসের কোটায় সীমিতকরণ হয়, তবে বলতে হবে এই সংস্কার আদৌ জনহিতে নয়।"

সর্বক্ষেত্রে সংঘাতের পথে সরকার যখন চলতে চাইছে তখন ঐকমত্য তো দূরূহ।

২০১১ সালের ৭ ডিসেম্বর সরকার সংসদের দুই কক্ষকে আশ্বস্ত করে বলেছিল খুচরো ব্যবসায়ে বহু ব্র্যান্ডের বিদেশী পুঁজি নিবেশ বিষয়টা আপাতত মুলতুবী থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত না জাতীয় স্তরে ঐক্যমত্য না হয়। এই বিষয়ে রাজ্যগুলির মতামতও নেওয়া হবে। কিন্তু সরকার প্রতিশ্রুতিমতো এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্যসরকার এবং বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনায় বসল না। যখন বিষয়টা সরকারের কাছে উত্থাপন করা হলো তখন সরকার পক্ষ থেকে বলা হলো যে, তারা সংসদে এমন প্রতিশ্রুতি দেয়নি যে, সরকার এ বিষয়ে সব রাজ্য বা সব দলগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসবে।

সরকার অবশ্য অর্ধচালাক। বিরোধী হিসেবে আমরা না-ছোড়। আমরা বললাম সংসদ চালু রাখতে হলে অবশ্যই খুচরো ব্যবসায়ে বিদেশী বিনিয়োগের বিষয়টা আলোচ্যসূচীর শীর্ষে রাখতে হবে এবং ভোটাভুটিতে যেতে হবে। যখনই আলোচনা শুরু হবে সেই সঙ্গে আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়াও চলবে। কিন্তু ইউপিএ সরকার উল্টে বলতে লাগল যে, অতীতে নীতি নির্ধারণের বিষয়ে কখনওই আলোচনা হয়নি। আমরা পূর্বের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে বললাম অতীতে নীতি সংক্রান্ত বিষয়ে ভোটাভুটিও হয়েছে।

প্রশ্ন হলো, কেন ভোটাভুটির বিষয়টি সংসদীয় গণতন্ত্রে অচ্ছুৎ হবে? বাস্তবে গণতন্ত্র হলো সংখ্যাতত্ত্ব নির্ভর। আর ভোটাভুটি হলো সেই গণতন্ত্রেরই অঙ্গ। প্রশাসকদের সিদ্ধান্তের ওপর অবশ্যই সংসদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে। প্রশাসনীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আলোচনা কোনও মতেই নীতিবিরুদ্ধ নয় যেখানে ইস্যু কেবল কথাবার্তায় মধ্যেই সীমিত নয় সেখানে ভোটাভুটি অবশ্যই প্রয়োজন। একটা চাপা সন্দেহের তীর অবশ্যই সরকারের দিকে যাবে যে, সরকার পক্ষ যতক্ষণ পর্যন্ত না তাদের 'বাধ্য বিরোধী'-দের সরকারের পক্ষে ভোট দেবার ব্যবস্থা না করতে পারে কিংবা তাদের দিয়ে ভোটাভুটির সময়ে ভোটদানে বিরত রাখার ব্যবস্থা না করতে পারে ততক্ষণ পর্যন্ত সরকার এই ইস্যুতে ভোটাভুটি নিয়ে সায় দেবে না। মনে হয় সরকার-ই চাইছে না সংসদ ঠিক-ঠাক চলুক। সরকারপক্ষ এমন অবস্থা তৈরি করতে চাইছে যে, অচলাবস্থা চলতেই থাকুক।

আমার আশা, এই সংসদীয় অধিবেশনে অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা চলুক। গড় জাতীয় উৎপাদনের উন্নয়নের হার ভীষণভাবে নেমে গেছে। আশঙ্কার কথা যে, জাতীয় অর্থনীতিতে উন্নয়নের হারকে লঘু করে ফেলা হচ্ছে। এরই মধ্যে সরকার নতুন প্রজন্মের সংস্কারের রব তুলে ধরার চেষ্টা চালাচ্ছে। সংস্কারের অপব্যাখ্যা করছে সরকার। 'সংস্কারে'র প্রতিশব্দ হলো সম্ভাবনাকে সুচারুরূপে রূপদান করা। সংস্কার যদি জনবিরোধী হয় এবং তার পরিণাম শুধু দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধি, রান্নার গ্যাসের কোটায় সীমিতকরণ হয়, তবে বলতে হবে এই

সংস্কার আদৌ জনহিতে নয়।

কৃষিক্ষেত্রের অবস্থা তথৈবচ। পরিকাঠামোর উন্নয়ন গতিরুদ্ধ। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ভুগছে কয়লার অপ্রতুলতায় এবং ক্রমশ ঋণের ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে। উৎপাদন শিল্প ভুগছে উচ্চ সুদের ঠেলায়। এছাড়া রয়েছে বিপণনের খামতি এবং সেইসঙ্গে গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো রয়েছে টাকার অধোগতি।

দুর্নীতির প্রসঙ্গটি অবশ্যই এই সংসদের অধিবেশনে আলোচনা হওয়া দরকার। লোকপাল বিলের অন্তর্গত অনেক বিষয়ে সহমত হলেও অনেক বিষয়েই মতৈক্য নেই। সিলেক্ট কমিটি কিছু বিষয়ে যেমন কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরোকে (সিবিআই) সরকারি শিকলমুক্ত করার পক্ষে বললেও তা নিয়ে সহমত নেই। সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট পেশ করার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যেভাবে তড়িঘড়ি সি বি আই অধিকর্তা নিয়োগ করা হলো কোলেজিয়ামের মতামত অগ্রাহ্য করেই তা কুরুচিকর। মনে হচ্ছে সরকার যেন সি বি আই-কে শিকলমুক্ত করার প্রয়াসে অস্বস্তি বোধ করছে। কয়লা বন্টন নিয়ে যে দুর্নীতি হয়েছে তা নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা করা প্রয়োজন।

সংসদের অধিবেশন সরকারপক্ষ একতরফা ক্যাগের গায়ে কালি ছিটিয়ে দিল। শেখানো বুলি পড়িয়ে ক্যাগের প্রাক্তন এক আধিকারিককে সংবাদ শিরোনামে স্থান করে দেওয়া হলো। এই নির্বাচিত নাটকে ইউপিএ সরকারের সভানেত্রী নিজে সামিল হয়ে বললেন, ২-জি স্পেকট্রামে ক্ষতির পরিমাণ যেভাবে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বলা হচ্ছে তা মূলত বিজেপির-ই ষড়যন্ত্রের ফলে। সরকার হেনস্থা হলো যখন ওই আধিকারিক পাল্টি খেলেন এক টি ভি সাক্ষাৎকারে। আগে পি এ সি-র অধ্যক্ষের নাম বললেও পরেই উনি বলেছেন যে, ড. মুরলী মনোহর জোশী নন, অন্য অজ্ঞাতনামা কেউ ক্যাগ রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছিলেন।

জরুরি আইন প্রণয়ন ঝুলে রয়েছে। আমরা বিরোধীপক্ষ সরকারের সঙ্গে সহমতের ভিত্তিতে সংসদ চালাতে চাই। যাই হোক, ওই অবস্থায় পৌঁছোবার আগেই সরকারকে খুচরো ব্যবসায় বিদেশী পুঁজি নিবেশের বিষয়টি নিষ্পত্তি করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সরকার ভোটাভুটির বিষয়টা মিটিয়ে ফেলে তত তাড়াতাড়ি সহজে সংসদের কাজকর্ম শুরু হবে।

(লেখক রাজ্যসভায় বিরোধীদলের নেতা সৌজন্যে : দি ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস)

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক
পড়ুন ও পড়ান
স্বস্তিকা
প্রতি সংখ্যা মূল্য ৭.০০ টাকা
বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য ৩২৫ টাকা

নেত্রদান মহাদান

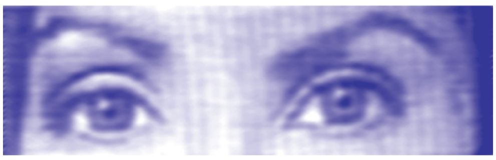

EYE BANK
23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451
অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387
সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®
নিখুঁত লেখার খাতা

প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.................. কলাম।
PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane (1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net
PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

আমার সেই সোনার বাংলা কই, আমি যে তাকে বড় ভালোবাসি

অসিত বরণ ঠাকুর

কবি, সাহিত্যিক ও গীতিকারেরা সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলার বাংলাকেই সোনার বাংলা বলেছেন। তাঁর বেশিরভাগটাই আজ ওপার বাংলায়। যা আজ বঙ্গবন্ধুর স্বাধীন বাংলাদেশ বলে খ্যাত। ১৯৭১ সালে বাংলাভাষার প্রশ্নে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হলেও তাকে ইসলামিক পাকিস্তানের জন্মের ইতিহাসের সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংঘাত করতে হচ্ছে। গৃহযুদ্ধ হচ্ছে প্রকৃতি নির্ভর সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্গে বৈদেশিক আরবীয় ইসলামিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার। সাধারণ মানুষ দিশেহারা হয়ে বাংলা জাতীয়তাবাদ ভুলে সাচ্চা মুসলমান হওয়ার প্রতিযোগিতায় নাম লেখাচ্ছে। ধর্মভিত্তিক দেশের পরিণতি হয়তো তাই-ই হয়।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বঙ্গোপসাগরের ব-দ্বীপ অঞ্চল, গাঙ্গেয় নিম্ন উপত্যকা, অজস্র নদ-নদী, খাল-বিল অধ্যুষিত উর্বর বাংলা স্বভাবজাতভাবে বহু কবি, সাহিত্যিক, মনীষী, সাধু-সন্ত, বিপ্লবী, রাজনীতিবিদ, বিজ্ঞানী ও জ্ঞানী-গুণীদের জন্ম দিয়েছে। এর বড় অংশই ওপার বাংলায় পড়েছে। প্রথমে কলকাতা ও পরে ওপারের ঢাকা সভ্যতার অগ্রগতির কেন্দ্রবিন্দুর কাজ করেছে। ধর্মভিত্তিক বাংলা বিভাজনের স্বাধীনতা লাভে বাঙালির ক্ষতি হয়েছে সব থেকে বেশি। পাঞ্জাবীরা রক্তপাতের মাধ্যমে লোক বিনিময় করে স্থায়ী সমাধান করলেও বাঙালিরা তা করতে না পারায় বাংলাদেশে ইসলামি মৌলবাদের শিকার হয়ে সংখ্যালঘুরা উদ্বাস্তু হয়ে ভারতে আসতে আজও বাধ্য হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৮.৫ শতাংশ সংখ্যালঘুরা নিঃশেষিত না হওয়া পর্যন্ত হয়তো তা চলবে।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। জননী চলে গেছেন। কিন্তু বিদেশ হলেও বাংলাদেশের জন্মভিটার নাড়ির টান ও ছোটবেলার সোনালি দিনগুলোর স্মৃতি কিছুতেই ভুলতে পারছিলাম না। ১৯৪৯ সালে ৭/৮ বছর বয়সে মাকে ছেড়ে কাকা-কাকিমার হাত ধরে এদেশে এসেছি। স্কুলের গণ্ডি পারের পর বার দু-এক এবং সরকারিভাবে ১৯৯৯ সালে কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী বাস চালুর অনুষ্ঠানে ও পরে গেদে-দর্শনা হয়ে কলকাতা-ঢাকা যাত্রীবাহী ট্রেনের ট্রায়াল রানে

বাংলাদেশে গিয়েছিলাম। এখন বয়স কথা বলছে। তাই দেরি না করে পাসপোর্ট-ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে বেরিয়ে পড়লাম। হরিদাসপুর- বেনাপোল বর্ডার পার হয়ে যশোর, খুলনা, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, ঢাকা, কুমিল্লা, ফেনি, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ঘুরলাম, থাকলাম, ঘৃতকান্দির জন্মভিটা, ওড়াকান্দি, রামদিয়া ও অন্যান্য পরিচিত জায়গায় গেলাম, স্মৃতি মন্থন করলাম, পরিচিত-অপরিচিতদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করলাম। সবই যেন কেমন জীর্ণ, শীর্ণ, বিবর্ণ, মলিন এবং প্রাণহীন। ছোটবেলার স্মৃতির সঙ্গে মিল খুঁজে না পেয়ে বড় আশাহত ও ব্যথিত হয়েছি। আমার স্মৃতির সোনার বাংলা কোথাও খুঁজে পেলাম না। চিরতরে হারিয়ে গেছে। বাঙালি হয়েও যেখানেই গেছি সেখানেই বিদেশি চিহ্নিত হয়ে প্রতারণা ও ঠগবাজদের শিকার হয়েছি। মনে হচ্ছিল জন্মভূমি দেখতে না গেলেই ভাল হোত। পুরাতন স্মৃতিগুলো অন্তত অপরিবর্তিত থেকে সুখানুভূতি দিত ও জন্মভূমির গর্ব অমলিন থাকত।

বাংলাদেশ কেন তাঁর পুরাতন গৌরব হারিয়ে ক্ষুধাপীড়িত পরনির্ভর দেশে পরিণত হয়ে ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদের শিকার হলো তার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কেননা বাংলাদেশ ভারতীয় ভূখণ্ডে ঘেরা বাংলাভাষী অতি গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র। তাদের ভালমন্দের প্রভাব আমাদের উপর পড়বেই। আমার সীমিত অভিজ্ঞতায় নিম্নে বর্ণিত কারণগুলি তার বর্তমান অবনমনের জন্য দায়ী বলে মনে করি। প্রথমত, বাংলা ভাগের কারণে জ্ঞানী-গুণী, সৃজনশীল, সংস্কৃতিবান ও সংবেদনশীল মানুষদের অধিকাংশ ভারতে চলে এসেছিল। সেই আগমন আজও অব্যাহত। শূন্যতা পূরণের আগেই মুক্তিযুদ্ধে বহু জ্ঞানী-গুণীজনদের আত্মাহুতি হওয়ায় সেই অভাব আজও পূরণ হয়নি। দু' চারজন যারা আছেন তাঁরা পাকিস্তানী মদতেপুষ্ট ধর্মীয় মৌলবাদীর চাপে ও প্রভাবে মাথা তুলতে পারছে না। ফলে সাধারণ মানুষ ধর্মনিরপেক্ষতা, সহনশীলতা, জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক চেতনা থেকে বঞ্চিত হয়ে ধর্মান্ধতায় নিমজ্জিত হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সুফলের প্রতিফলন ও তার প্রসারের আন্দোলন থমকে আছে।

দ্বিতীয়ত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ থাকা সত্বেও আজও বঙ্গবন্ধুর সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও বাংলা জাতীয়তাবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়নি নানান বাধায় ও জটিলতায়। মুক্তিযুদ্ধের অপরাধীদের বিচারে বিলম্ব হচ্ছে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের শত্রু সম্পত্তি পুনরুদ্ধার ও ফিরিয়ে দেওয়ার প্রয়াসে অস্বচ্ছতা ও আইনি জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁরা ভোটের সময় গুরুত্ব পেলেও সরকারি সাহায্য-সহানুভূতি ও চাকুরি থেকে

বঞ্চিত হয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ঢাকায় আমার আত্মীয়া অধ্যাপিকা বললেন তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মর্যাদা দেওয়া হয়। অর্থবান সংখ্যালঘুরা ভারতে একপা রেখে বাস করে। তারা সম্পত্তি কিনে বা পরিবারের অর্ধেক পাঠিয়ে রেখেছে। কিন্তু বাকিরা জয়বাংলার হাতছানিতে ভারত থেকে ফিরে গিয়ে আফসোস করে ভাগ্যের কাছে তাঁদের ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়েছে। হালের বুদ্ধ মন্দিরের উপর আক্রমণে আন্তর্জাতিক স্তরে দেশ কালিমালিপ্ত হওয়ায় বৈদেশিক সাহায্যে বাধা আসছে।

তৃতীয়ত, মুসলমান সংখ্যাগুরুরা নিজেরা নিজের দেশ শাসন করলেও তাদের মধ্যে অমূলক পুরোনো আশঙ্কা ও হীনমন্যতা কাজ করছে বলে ধর্মকে বর্ম ভেবে বেশি করে আঁকড়ে ধরছে এবং ধর্মের অনুশাসন রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষাক্ষেত্রে ও প্রশাসনে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যেমন আমার জন্মস্থান রামদিয়ার শতাব্দী প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণ কলেজকে এস. কে. কলেজ করে দেওয়া হয়েছে। ধর্মীয় মৌলবাদীরা, রাজনীতিবিদরা, ব্যবসায়ীরা, ধনী ও ধান্দাবাজরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অজ্ঞ ও গরিবদের শাসন, শোষণ, বঞ্চনা ও প্রভুত্বের বহর বাড়িয়ে দিচ্ছে। নতুন প্রজন্ম আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে আধুনিক সমাজ ও সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দেশ গঠন ও পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারছে না। এই অবস্থায় গরিব, অশিক্ষিত মুসলমান ও সাধারণ মানুষরা এবং সর্বোপরি দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। সর্বস্তরে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, অনৈতিকতা, অন্যায়, অত্যাচার, অনাচার, অবিশ্বাস ও হিংসা-প্রতিহিংসা জাঁকিয়ে বসেছে। সরকারি কর্মচারী, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও জমিজোতের মালিকরাই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়ে ফুলে ফেঁপে উঠছে। ওই শ্রেণীর লোকেরা বড়োলোক আর বাকিরা গরিব থেকে ভিক্ষুকে পরিণত হয়ে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও রোগভোগের শিকার হয়ে অমানবিক জীবনে অভ্যস্ত হচ্ছে। দেশে চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, ঠগবাজ ও সন্ত্রাসবাদীর সংখ্যা বাড়ছে। এ থেকে বেরোতে আর এক 'বঙ্গবন্ধু'র প্রয়োজন।

চতুর্থত, ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের সুফলকে কাজে লাগিয়ে নতুন চেতনা, আধুনিক সমাজ ও সভ্যতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলন থমকে আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা রাজনীতির শিকার। দেওয়াল লিখন দেখে মনে হলো ছাত্র আন্দোলন বন্ধ। বাংলাদেশের বামপন্থীরা ব্রাত্য। মৌলানা ভাসানি বা অরাজ আলি মাতব্বররা জনজীবন থেকে বহিষ্কৃত। গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচার প্রায় বন্ধ। দু'চারজন যাঁরা ধর্মান্ধতা থেকে বেরিয়ে এসে সমাজ সংস্কার বা পরিবর্তনের চেষ্টা করতে চেয়েছেন তাঁদের হয় নিশ্চুপ করে এক ঘরে করে রাখা হয়েছে নয়তো তসলিমা নাসরিন বা শাহরিয়র কবীরদের মতো দেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ বলতে প্রাকৃতিক সম্পদকেই বোঝায়। প্রাকৃতিক গ্যাস ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হওয়া ছাড়া মাটির নীচে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু খনিজদ্রব্য এখনও পাওয়া না গেলেও জল-জঙ্গল, নদীনালা, খালবিল, পাহাড়, সমুদ্র, পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বঙ্গোপসাগরীয় ব-দ্বীপ অঞ্চল, সুন্দরবনের বড়ো অংশ ও সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা উর্বর মাটি, গাছপালা, ফলমূল, রয়েল বেঙ্গল টাইগার সহ বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তু, জলজ প্রাণী ও ইলিশ সহ বহুবিধ সুস্বাদু মাছ দেশের প্রধান সম্পদ। পর্যটনশিল্প উপযোগী সর্ববৃহৎ বঙ্গোপসাগরীয় বিস্তীর্ণ সমতল সমুদ্র সৈকত বাংলাদেশের সবচাইতে বড়ো সম্পদ, যা আর কোনও দেশে নেই। আছে পৃথিবী বিখ্যাত চট্টগ্রামের সমুদ্র বন্দর। আর আছে তাদের পরিশ্রমী মানুষ যাঁদের সঠিক ভাবে কাজে লাগাতে পারলে আবার সোনার বাংলা বানানো যায়।

প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই বাংলাদেশ কেন এত গরিব, অনুন্নত এবং পরদেশমুখাপেক্ষী সে প্রশ্নের জবাব খুঁজতে খুব গবেষণার প্রয়োজন নেই। এ ব্যাপারে আমার মতামত পূর্বেই দিয়েছি। এ প্রসঙ্গে ইউরোপের পাহাড় ঘেরা ছোট দেশ সুইজারল্যান্ডের কথা বলবো। ওই দেশের বিচক্ষণ দেশনায়করা দেখল তাদের সম্পদ বলতে ছোটবড় কিছু পাহাড়, গাছপালা আর সুন্দর প্রাকৃতিক মনোরম পরিবেশ। সমুদ্র নেই। খনিজ সম্পদ তেমন কিছু নেই। তাই তাঁরা ঘড়ি তৈরির কুটির শিল্প বেছে নিল যাতে খুব সামান্য ইস্পাত বিদেশ থেকে আনতে হবে। গোপনে অর্থ লুকিয়ে রাখার জন্য বিখ্যাত সুইস ব্যাঙ্ক খুলল। আর পর্যটন শিল্প করলো। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এই তিনটিই আজ পৃথিবী

> **“বাংলাদেশে ঘোরার অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে বাংলাদেশিরা উন্নত ভারতকে ঈর্ষা ও হিংসা করে কিন্তু তাঁদের স্বশাসনের স্বার্থে ভিন্ন ধর্মীয় স্বত্বা ও পরিচয়-কে হারাতে চায় না। তাই তারা ভালো বা উন্নত মানুষ হওয়ার চেষ্টার পরিবর্তে সাচ্চা আরবীয় মুসলমান হওয়ার প্রতিযোগিতায় নাম লেখায়। কেননা এতে ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ হয় এবং পরে রাজশক্তি পাওয়ার রাস্তা সুগম হয়।”**

বিখ্যাত হয়ে দেশকে উন্নতির উচ্চ শিখরে নিয়ে গেছে। আমরা জন্মভিটা দেখার উপলক্ষে বাংলাদেশে গেলেও সপরিবারে বেড়ানোর ইচ্ছা নিয়েই গিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতেই হচ্ছে যে আমরা হতাশ হয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছি। বর্তমানে বাংলাদেশে পয়সা দিলেও ভালো খাবার মেলে না, যোগাযোগ ব্যবস্থা খুব খারাপ। বিদেশীদের, বিশেষ করে ইন্ডিয়ানদের (ওরা ওই বলে ডাকে), সন্দেহের চোখে দেখে এবং পদেপদে হয়রানি করে ঠকায়। দু'চারটি খাবারবিহীন আবাসিক হোটেল ছাড়া পর্যটনের কোনও পরিকাঠামো নেই। ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি অনুসারে ভিসায় পয়সা না লাগলেও বাংলাদেশ জনপ্রতি ৩০০ টাকা পর্যটন কর নেয়। ঢাকায় আত্মীয়র বাড়িতে থাকলেও গোপালগঞ্জ, কক্সবাজার (এম পি কাজলের হোটেল) ও খুলনার বড় হোটেল থেকেও খাবারের জন্য বাইরের রেস্তোরাঁয় যেতে হয়েছে। প্রতিটি খাবারের অস্বাভাবিক দাম। তরকারি অপ্রতুল, সামুদ্রিক ও ভারতীয় মাছ ছাড়া লোকাল মাছ প্রায় মেলেই না। তাও ১৫০ টাকায় এক খণ্ড মিলবে। ঢাকা-মোড়লগঞ্জের রকেট স্টিমারে ২১ ঘণ্টার যাত্রাপথে এক খণ্ড ছোট স্বাদহীন ইলিশের টুকরো ২০০ টাকায় খেতে হয়েছে। প্রতিটি রেস্তোরাঁয় বাড়তি বিল করে আমাদের ঠকিয়েছে। ধরে ফেলায় দু'এক জায়গায় টাকা ফেরত পেয়েছি।

বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থায় বেসরকারি বাস, গাড়ি/অটো/ রিক্সা বা স্টিমার/লঞ্চ/নৌকা পাওয়া যায়। সরকারি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ভাড়া খুব বেশি দিতে হয়। বৃটিশ আমলের রেলের কোনও সংস্কার বা সম্প্রসারণ হয়নি। দূরপাল্লার পুরাতন গাড়ি কয়েকটা চলে। বেসরকারি মালিকানায় চালানো হয় বলে ভাড়া বড্ড বেশি। খুলনা থেকে বেনাপোলে পাঁচ-কামরার ভীড়ে ঠাসা রেলগাড়িতে তিন ঘণ্টায় ফিরতে ৪৫ টাকা লেগেছে। এই লাইনের গাড়িতেই ৬৩ বৎসর আগে খুলনা থেকে উঠে কাকার হাত ধরে শিয়ালদা স্টেশনে নেমে হিন্দুস্থানে এসেছিলাম। আমার মতো লক্ষ লক্ষ হিন্দু ভিটেমাটি ছেড়ে ওই একই পথে এসেছেন। রেলে বা জলযানে ভীড় হলেও যাওয়া যায় কিন্তু ভিড় বাসে যাতায়াত খুবই কষ্টদায়ক। বেনাপোল থেকে গোপালগঞ্জ ও ঢাকা হয়ে কক্সবাজার এবং ঢাকা ফেরত দূরপাল্লার বাসে কষ্টেই যাতায়াত করেছি।

বাংলাদেশ বিদেশের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। শিল্পদ্রব্য থেকে খাদ্য, মশলা, ঔষধ, গাড়ি, লোহা, কয়লা ইত্যাদি সবই বাইরে থেকে যায়। এর বেশিরভাগই ভারত থেকে বৈধ বা অবৈধ ভাবে যায়। আমদানির অর্থমূল্য এত বেশি হয় যে দেশে যা কিছু উৎকৃষ্ট বা বিক্রয়যোগ্য হয় সবই বিদেশে বিক্রি করে কিছুটা বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর চেষ্টা করে। ফলে স্বদেশে ভালো কিছুই পাওয়া যায় না বরং খাদ্য ঘাটতি দেখা দিয়ে মূল্য বৃদ্ধি ঘটায়। সরকারের সুবিধা ও ব্যবসায়ীদের পকেট ভারি হলেও গরিব এবং আমজনতার সর্বনাশ ডেকে আনছে। তাদের অর্ধাহারে ও অনাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে। নতুন শিল্প বা কর্মোদ্যোগ সৃষ্টি না হওয়ায় কর্মহীন মুসলিম যুবক-যুবতীরা, শিশুরা এমনকি গোটা পরিবার দেশ-বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে খিদের জ্বালা মেটাতে। আমাদের উভয়ের স্বার্থে ভারত-বাংলাদেশের বকেয়া সমস্যা মেটানো দরকার। তিস্তা জলবন্টন, ছিটমহল বিনিময়, সহজ যাতায়াত, অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসবাদ প্রতিহত করা, বাণিজ্য সম্প্রসারণ, বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও সরকারি সুযোগ প্রদান বিষয়গুলির আশু সমাধান প্রয়োজন।

বাংলাদেশে ঘোরার অভিজ্ঞতায় মনে হয়েছে বাংলাদেশিরা উন্নত ভারতকে ঈর্ষা ও হিংসা করে কিন্তু তাঁদের স্বশাসনের স্বার্থে ভিন্ন ধর্মীয় স্বত্বা ও পরিচয়-কে হারাতে চায় না। তাই তারা ভালো বা উন্নত মানুষ হওয়ার চেষ্টার পরিবর্তে সাচ্চা আরবীয় মুসলমান হওয়ার প্রতিযোগিতায় নাম লেখায়। কেননা এতে ধর্মীয়, সামাজিক, আর্থিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি লাভ হয় এবং পরে রাজশক্তি পাওয়ার রাস্তা সুগম হয়। বাংলাদেশের কর্ণধারদের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তবে আমি অকপটে স্বীকার করব বাংলাদেশের মেয়েরা কেউ কেউ বাধ্য হয়ে বোরখা পরলেও বাইরে বেরিয়ে আসছে, সবকিছুতে যোগদান করছে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করছে। আমরা যখন রকেট স্টিমারে ফিরছিলাম তখন আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণির কেবিনের সামনের এক কোণে স্বামী ও ছোটো বাচ্চা নিয়ে বসে থাকা ২২/২৩ বৎসরের এক মুসলমান গৃহবধূ কেবিনম্যানকে খেঁকিয়ে বলছে "পয়সা দিছি না, উঠ্‌ ক্যান?" সপ্রতিভ উত্তরে হকচকিত হয়ে কাছে গিয়ে জানতে পারলাম যে, সে এইট পাশ করেছে। বাচ্চাটি আমার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে আমাকে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার নেমন্তন্ন করল। এইটাই আমার বেড়ানোর সেরা পাওনা। জানা গেল বাংলাদেশে সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্মভিটার গ্রামে সুনীল মেলা হয়। প্রণব মুখোপাধ্যায়ের রাষ্ট্রপতি হওয়ার আনন্দোৎসব হয়েছে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। নির্বাচন আসছে। দিনক্ষণ ঘোষণা বাকি। মানুষ একটু ক্ষুব্ধ। শাসক পরিবর্তন হলে পশ্চিমবাংলার তথা ভারতের দুশ্চিন্তার কারণ আছে। সেক্ষেত্রে উদ্বাস্তু আগমন ঘটবে।

ধর্মের প্রয়োজন অনেক আগেই ফুরিয়ে গেছে। রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে সেটি অচল পয়সায় পরিণত। কিছু কায়েমি স্বার্থের প্রভুত্ববাদী মানুষ টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তাঁদের শত চেষ্টা সত্বেও ধর্মব্যবস্থা টিকবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ধর্ম অতীতে সমাজ গঠনে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তেমনিভাবে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ঈশ্বরবাদ ও তাঁর নামে প্রচলিত ধর্ম, বর্ণ, জাতপাত এবং নৃতাত্ত্বিক বিভাজন, ভাষা, ভৌগোলিক সীমারেখা বা অন্য কোনও কৃত্রিম বিভেদ ভেঙে ফেলে মানবতাধর্মী এক নতুন সমাজ ও সভ্যতার পৃথিবী জন্ম দেবে। সেখানে মানুষই হবে একমাত্র বিবেচ্য, বিজ্ঞান হবে চালিকা শক্তি, ধর্ম হবে মানবতাবাদ, কর্ম হবে জীবনমুখী, লক্ষ্য হবে আনন্দ, দায়িত্ব হবে জাগতিক ভারসাম্য রক্ষা করা এবং সমাজ হবে মুক্ত সমাজ। এক সমাজ এক পৃথিবীর লক্ষ্যেই ইউ এন ও কাজ করছে। দেওয়া নেওয়ার মধ্যেই মিলনের সূত্র লুকিয়ে থাকে। ভারতীয় উপমহাদেশের শান্তি, সুস্থিতি ও মানবিক উন্নয়নে দেওয়া নেওয়ার মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের সমঝোতায় আসা দরকার। সত্য হউক— দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।

মহিলাদের সুরক্ষায় ‘বীরাঙ্গনা বাহিনী’ গড়ছে অসম পুলিশ

বিরাজ রায় ॥ এ-রাজ্যের মতো অসমেও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে মহিলাদের উপর আক্রমণ। একের পর এক ঘটে চলেছে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, ছিনতাইয়ের মতো ঘটনা। রাজ্যের রাজধানী খোদ গৌহাটিতে দিনের বেলাতেও মহিলারা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। দুষ্কৃতীদের প্রধান লক্ষ্যই মহিলারা। প্রশাসন যথেষ্ট তৎপরতা দেখালেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। তাই মহিলাদের নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে মেয়েদের নিয়েই একটি বিশেষ নারী বাহিনী গঠন করছে অসম পুলিশ। যারা দুষ্কৃতীদের হাতেনাতে শায়েস্তা করতে তৎপর থাকবে। আগামী ২৬ জানুয়ারি ‘বীরাঙ্গনা’ নামে এই ইউনিটের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করা হবে। কালো সামরিক পোশাক ও লাল টুপি পরা বীরাঙ্গনারা মাইক নিয়ে অনর্গল ঘুরে বেড়াবে শহরের রাস্তায়। সাদা পোষাকে হানা দেবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানেও। ডেরগাঁও ব্যাটেলিয়ন ট্রেনিং ক্যাম্পে চলছে তারই মহড়া। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে শক্তসমর্থ চৌত্রিশ জন মেয়েকে নিয়ে গঠিত দলটিকে দেওয়া হচ্ছে বিশেষ প্রশিক্ষণ। ভারতে এই প্রথম মেয়েদের নিয়ে এরকম একটি ইউনিট গড়া হচ্ছে।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরোর মতে মহিলাদের উপর হিংসায় ২০১১-তে অসম দেশে দ্বিতীয় স্থানে ছিল। বীরাঙ্গনা বাহিনী রাজ্যকে এই জায়গা থেকে বার করে আনবে বলে আশাবাদী অসম পুলিশ। ইন্সপেক্টর জেনারেল ভাস্কর জ্যোতি মহান্ত জানিয়েছেন— হিংসার শিকার হওয়ার পর মহিলারা অনেক সময় পুলিশের সামনে মুখ খুলতে অস্বস্তি বোধ করেন। বীরাঙ্গনা বাহিনী কেবল নিরাপত্তাই নয়, তাদের আত্মবিশ্বাসও অনেকটা বাড়িয়ে তুলবে।

চব্বিশ বছর বয়সি ববি বৈশ্য। ভেরগাঁও ট্রেনিং ক্যাম্প তিনি প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। সকাল পাঁচটা থেকে শুরু হচ্ছে তার দিনপঞ্জি। বন্দুক চালনা থেকে বিভিন্ন অস্ত্র প্রশিক্ষণ, শিখছে চীনা সামরিক কায়দায় লড়াইও। প্রচণ্ড গতিতে বিপজ্জনক ভাবে মোটরবাইক চালাতে পোক্ত করে নিচ্ছে নিজেকে। তারপর প্রাতরাশ সেরে ক্লাস করতে হচ্ছে আইনের বিভিন্ন ধারা জানতে। দুপুর আড়াইটের পর শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় সত্র, টানা দু-ঘণ্টা। এভাবেই কঠোর নিয়মের মধ্যে দিয়ে নিজেকে ইস্পাত তৈরি করছে সে। ‘এটা খুব শক্ত কাজ, তবে এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গর্ব হচ্ছে’ জানালো ববি। ‘মার্শাল আর্ট চ্যাম্পিয়ন’ পম্পি পতগিরি, সেও নিচ্ছে এই প্রশিক্ষণ। তারই ফাঁকে পম্পি জানিয়েছে নিজের বক্তব্য— ‘পেশিশক্তি মহিলাদের নির্যাতন করবে এই ধারা বদলে যাবে। যারা ধর্ষণ বা মেয়েদের থেকে ছিনতাই করে নিমেষের মধ্যে পালিয়ে যায় তাদের সামনাসামনি প্রতিরোধ করতে আমরা নিজেদের দক্ষ করে তুলছি।’ বিয়ের একমাস পরেই বীরাঙ্গনাতে যোগ দিয়েছে মন্দিরা। পরিবারকে মিস করলেও নিজের সিদ্ধান্তের জন্য তার কোনও দুঃখ হচ্ছে না। এরকমই দুর্বার মানসিক বল নিয়ে রাস্তায় নামছে ববি, পম্পি, মন্দিরার মতো বীরাঙ্গনারা।

চারমাস আগে গৌহাটিতে রাস্তায় একুশ বছরের এক তরুণীকে বিবস্ত্র করে চল্লিশ মিনিট ধরে শ্লীলতাহানির ঘটনায় গোটা দেশের দৃষ্টি পড়েছিল অসমের দিকে। এই ঘটনার পরেই নড়েচড়ে বসে সেখানকার প্রশাসন। তার আগে ইন্সপেক্টর জেনারেল (অসম পুলিশ) মহান্ত মেয়েদের নিয়ে একটি বিশেষ বাহিনী গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। যারা রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টি দেখবে। তার এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতে গত এপ্রিল মাসে অসম পুলিশের তিন জন মহিলাকে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য তামিলনাড়ু পাঠানো হয়েছিল। যেটাকে ‘সাইলেন্ট ড্রিল’ বলে। পরবর্তীতে এই প্রশিক্ষণ নিতে সক্ষম মেয়েদের বাছাই করে ‘বীরাঙ্গনা’ বাহিনী গঠনের কথা ভাবা হয়। গত ১৯ নভেম্বর অফিসিয়ালি ভাবে এই বাহিনীকে মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টিতে আনা হয়। স্থানীয় সংবাদ মাধ্যমও গুরুত্ব সহকারে বিষয়টিকে প্রচারের আলোয় এনেছে। ভেরগাঁও ট্রেনিং ক্যাম্পের কম্যান্ডিং অফিসার সত্যকাম হাজারিকা বলেছেন— বীরাঙ্গনাদের হাত থেকে বাঁচতে গুণ্ডাদের এবার সতর্ক হতে হবে, নয়তো এই রাস্তা ছাড়তে হবে।

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Chicken Masala
Sabji Mix
Kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Cumin Powder
SUPER Turmeric Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

মধ্যপ্রদেশে আয়োজিত ক্রীড়া ভারতীর রাষ্ট্রীয় খেল সঙ্গম

তপনমোহন চক্রবর্তী।। ক্রীড়া ভারতীর প্রথম 'রাষ্ট্রীয় খেল সঙ্গম' অনুষ্ঠিত হলো ২৩-২৫ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের রথলাম শহরের মিড টাউনে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৭০০ জন কার্যকর্তা ক্রীড়া ভারতীর প্রথম রাষ্ট্রীয় খেল সঙ্গমে উপস্থিত হয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে ৪৭ জন কার্যকর্তা এই শিবিরে যোগ দেন।

২৩ নভেম্বর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন হকির যাদুকর মেজর ধ্যানচাঁদের পুত্র অশোককুমার। অশোককুমার নিজেও অলিম্পিক গেমসে বেশ কয়েকবার ভারতীয় হকি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাঁর ভাষণে তিনি বলেন, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বই হচ্ছে ভারতে খেলাধূলার উন্নতির অন্তরায়। খেলা তাঁর কাছে একটি ধর্মবিশেষ। ধর্মের যেমন কোনও জাত হয় না, তেমনই খেলাধূলার লক্ষ্য হবে সব কিছু ভুলে একত্রিত হয়ে একই লক্ষ্যে এগিয়ে চলা। তিনি আশা করেন যে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে সব প্রতিভাবান খেলোয়াড় সুযোগের অভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন, ক্রীড়া ভারতী তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর কার্যকরী অধ্যক্ষ লক্ষ্মণরাও নারদিকার, উপাধ্যক্ষ নারায়ণ সিং রাণা, মহামন্ত্রী রাজচৌধুরী, কোষাধ্যক্ষ কমলাকার শিবসাগর ও প্রথম রাষ্ট্রীয় খেল সঙ্গমের সংগঠক চৈতন্য কাশ্যপ।

২৪ নভেম্বর রাষ্ট্রীয় খেল সঙ্গমের প্রধান আকর্ষণ ছিল যোগঋষি বাবা রামদেবের আগমন। রথলামের ঐতিহাসিক পোলো গ্রাউন্ড যা বর্তমানে নেহরু স্টেডিয়াম সেখানেই বাবা রামদেবের ভাষণের ব্যবস্থা করা হয়। তাঁর উপস্থিতিতে গণসূর্য-নমস্কারের একটি প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন ক্রীড়া সঙ্গমে যোগদানকারী সব বয়সের সকল পুরুষ ও মহিলা কার্যকর্তা এবং স্থানীয় সরস্বতী শিশু মন্দিরের কিছু ছাত্রছাত্রী। সেদিনের অনুষ্ঠানে জাতীয় ঐতিহ্যবাহী আরও কিছু খেলাধূলার প্রদর্শন করা হয়। যেমন— মহারাষ্ট্রের গোপনৃত্য, কোলানুরের মরদানী খেলা, লেজিম, যোগাসন ইত্যাদি।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা থেকে এই খেল সঙ্গমে যারা এসেছিলেন, রঞ্জিত বালা ও পবন ময়রার নেতৃত্বে তারা প্রদর্শন করেন একটি নান্দনিক যোগাসনের অনুষ্ঠান। হাজার কয়েক দর্শকের করতালিতে তাঁরা বারবার অভিনন্দিত হন। স্থানীয় পত্রপত্রিকায় এই অনুষ্ঠানটি ছবিসহ বিশেষভাবে উল্লেখিত ও প্রশংসিত হয়। বাবা রামদেবের আশীর্বাদে তাঁরা ধন্য হন।

এই সমাবেশে স্বাগত ভাষণ দেন ক্রীড়া ভারতীর সর্বভারতীয় অধ্যক্ষ প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় চেতন চৌহান। কী উদ্দেশ্যে ক্রীড়া ভারতী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাঁর ভাষণে জনসাধারণের কাছে তিনি তা ব্যক্ত করেন। বাবা রামদেব প্রথম রাষ্ট্রীয় খেল সঙ্গমের স্মারক পত্রিকা 'ক্রীড়ায়ন' প্রকাশ করে তাঁর বক্তব্যে বলেন যে, ভারতীয় খেলাধূলার পরম্পরা বজায় রাখতে হবে। দেশীয় খেলার বিশেষ করে যোগাসনের উপর গুরুত্ব দিয়ে চর্চা করতে হবে। নিরামিষ আহারের উপদেশ দিয়ে তিনি বিজাতীয় সংস্কৃতি বর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ২০১৫ সালের পরবর্তী খেল সঙ্গমটি যাতে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় সে বিষয়ে তিনি ক্রীড়া ভারতীর অধ্যক্ষকে অনুরোধ করেন। সেখানে দেশীয় খেলার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। এই সভায় রথলাম শহরের বহু

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

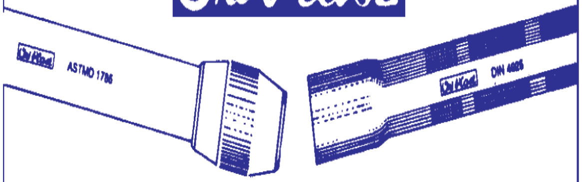

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833

15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ শিবির

পুণ্যস্নান—১৩ জানুয়ারি, ২৭ জানুয়ারি,১০ ফেব্রুয়ারি, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

৫ দিন থাকা-খাওয়া ১০০০ টাকা ও ২০০০ টাকা।
ট্রেনের টিকিট নিজেরা কাটবেন।
স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা আছে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—

রামকৃষ্ণ আশ্রম,
৬৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কালকাতা-১৩

ফোন : ২২৬৫-৬৭০৪,
৯৪৭৭৯৪৩৪৯৭

“সেদিন আমরা একত্র হইনি—আজও নয়”

কত বিপদ গিয়েছে। কই একত্র তো হইনি। বাহির থেকে যখন প্রথম আঘাত নিয়ে এল মহম্মদ ঘোরী তখন হিন্দুরা সে আসন্ন বিপদের দিনেতেও তো একত্র হয়নি। তারপর যখন মন্দিরের পর মন্দির ভাঙতে লাগল, দেবমূর্তি চূর্ণ হতে লাগল, তখন তারা লড়েছে, মরেছে, খণ্ড খণ্ড ভাবে যুদ্ধ করে মরেছে। তখনও একত্র হতে পারল না। খণ্ডিত ছিলেম বলেই মেরেছে, যুগে যুগে এই প্রমাণ আমরা দিয়েছি।

*[কালান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—‘স্বামী শ্রদ্ধানন্দ’
প্রবন্ধ—মাঘ ১৩৩৩]*

সৌজন্য : আশিস কুমার মঙ্গল
৩৩, গোরাচাঁদ বোস রোড, কলকাতা-৭০০০০৬

গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

২৫ নভেম্বর শিবিরের শেষ দিনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কয়েকজন কৃতী কার্যকর্তাকে কাজের স্বীকৃতিতে ক্রীড়া ভারতীর স্মারক উপহার দিয়ে সম্মান জানানো হয়। পুরস্কৃত করা হয় শিবিরে অনুষ্ঠিত সূর্য নমস্কার প্রতিযোগিতার কৃতীদের। মহিলা ও পুরুষ পৃথক ভাবে বয়সের ভিত্তিতে এই প্রতিযোগিতা হয় তিনটি বর্গে। প্রথম বর্গ— ১৫ বছর বয়সের নীচে, দ্বিতীয় বর্গ— ১৫ থেকে ৩০ বছর এবং তৃতীয় বর্গ— ৩০ বছরের উর্ধ্বে। এই প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্গে যথাক্রমে প্রথম হন পশ্চিমবঙ্গের সুশঙ্কর কয়াল (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) ও গোষ্ঠবিহারী ঘোষ (নদীয়া)। মহিলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্গে দ্বিতীয় হয়েছে অর্পিতা বৈদ্য (দক্ষিণ ২৪-পরগণা)। এই অনুষ্ঠানে কার্যকরী অধ্যক্ষ লক্ষ্মণরাও পারদিকার ঘোষণা করেন যে ক্রীড়া ভারতীর কয়েকজন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও লেখকদের নিয়ে একটি নিউজ মিডিয়া গঠিত হয়েছে এবং এই মিডিয়ার দায়িত্বে থাকবেন দক্ষিণবঙ্গের ক্রীড়া ভারতীর অধ্যক্ষ তপনমোহন চক্রবর্তী।

শিবির চলাকালীন সকাল ও বিকেলে কবাডি, খো খো, ভলিবল খেলা ছাড়াও বিভিন্ন প্রদেশের দেশীয় খেলাধূলার প্রদর্শন করা হয়। নিয়মিত বৈঠক ও চর্চারও ব্যবস্থা ছিল।

তিনদিনের এই শিবিরে সর্বক্ষণের জন্য ছিলেন চেতন চৌহান, লক্ষ্মণরাও পার্দিকার, নারায়ণ সিং রানা, কমলাকার শিবসাগর, রাজ চৌধুরী, অনিল ঘোষ ও আরও অনেকে।

রথলামে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া ভারতীর প্রথম রাষ্ট্রীয় খেল সঙ্গমের ব্যবস্থাপকেরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সঙ্গে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। যাতায়াত, থাকা খাওয়া, শৌচালয়, স্নানাগার, পানীয় জল— সব কিছুর ব্যবস্থাই ছিল সুপরিকল্পিত ও উন্নতমানের।

পশ্চিমবঙ্গের ক্রীড়া ভারতী পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত মধুময় নাথ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে শিবিরে যোগদানকারী পশ্চিমবঙ্গের দলটিকে পরিচালনা করেন।

পরাবর্তনে সামিল চারশো বনবাসী

পরাবর্তনের মাধ্যমে নিজধর্মে ফিরে এলো প্রায় চারশো বনবাসী। গত ২৮ নভেম্বর বুধবার রামপুরহাটের ভাটিনা গ্রামে সিংহবাহিনী মন্দিরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে এই পরাবর্তনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পারিষদের ধর্মপ্রসার বিভাগের জেলা সম্পাদক দেবাশিস চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যন্য পদাধিকারীরা। ভাটিনাগ্রাম ছাড়াও রামপুরহাটের বাণীনগর, মসরা, নলহাটি, গোবরাজুলি থেকেও কয়েক হাজার বনবাসী অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

এদিন সকালে বনবাসীরা পুকুরে স্নান করে মাথায় ঘটভর্তি জল নিয়ে শোভাযাত্রাসহ মন্দির চত্বরে সমবেত হয়। তারপর শিবের মাথায় জল ঢেলে প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়া হয় গীতা। শুদ্ধি যজ্ঞে ধান ছিটিয়ে তারা আবার ফিরে এলো হিন্দুধর্মে। ঝাড়খন্ড সীমান্ত ঘেঁষা এই গ্রামগুলিতে খৃস্টান মিশনারীরা দীর্ঘদিন ধরেই বনবাসীদের ধর্মান্তকরণ করে আসছে। নিজধর্মে ফিরে এসে অনেকে জানিয়েছেন —'পাদ্রীরা আমাদের ছেলেদের পড়াবে, বাড়ি করে দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু কিছুই করেনি। আমরা বুঝতে না পেরে খৃস্টান হয়েছিলাম।' রামপুরহাটে পরাবর্তন এই প্রথম নয়। এর আগে ২০০২ সালেও শতাধিক মানুষ পরাবর্তিত হয়েছিল। এই কর্মসূচী চলতে থাকবে বলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুখপত্র

প্রণব

পড়ুন ও পড়ান

কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী শতবর্ষ উদ্‌যাপন সমিতি

সমাপ্তি অনুষ্ঠান

১১ই ডিসেম্বর '১২, সন্ধ্যা ৫.৩০ মিনিট

মহাজাতি সদন

—: *প্রধান অতিথি ও বক্তা* :—

পূজনীয় মোহনরাও ভাগবত

সরসঙ্ঘচালক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

বিশেষ অতিথি : পূজ্যপাদ দেবানন্দ ব্রহ্মচারী

রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
সভাপতি

প্রণব রক্ষিত
সাধারণ সম্পাদক

সকলের সবান্ধব সানুগ্রহ উপস্থিতি কামনা করি

বিবেকানন্দ
যুব শিবির : ২০১৩

বিবেকানন্দ যুব শিবির - ২০১৩

অংশগ্রহণের বয়স ১৫ থেকে ৪০ পর্যন্ত

১১-১৩ জানুয়ারি, ২০১৩

স্থান : গয়েশপুর, কল্যাণী, নদীয়া

সৌজন্যে—

আন্তর্জাতিক স্তরে সাফল্যের অভিজ্ঞতায়

স্বদেশীর পথে স্বদেশে ফেরা

লেভিন অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড

(স্বদেশী চিন্তন বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ)

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা সুন্দরবন ভ্রমণ করুন ....

বনভূমি ট্রাভেলস্

প্রো ঃ - মৃগাঙ্ক রায়

৯৭৩৪২০৬০৪০ / ৯৮০০৬৮৪২০১

ক্যানিং রেলওয়ে নিউ মার্কেট,

ক্যানিং টাউন, দক্ষিন ২৪ পরগনা, পিন -৭৪৩৩২৯

Email : banbhoomitravels@gmail.com

বেহালা অনুকারের সাম্প্রতিক নাটক 'শিষ্য উপাখ্যান'

বিকাশ ভট্টাচার্য।। আমরা যারা নাটক নিয়ে কাজ করি, নাটক নিয়ে স্বপ্ন দেখি, নাটকের জন্য দল বাঁধি, নাটকের জন্য একই নৌকার সহযাত্রী হয়ে আমরা যারা যেতে পারি অনেকটা পথ, তারাই যখন বসি প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসেব কষতে তখন মাঝে-মাঝেই ভেঙে যায় আমাদের পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধনটা। কেন এমনটা হয়? গ্রুপ থিয়েটারের ৬৫ বছরের ইতিহাসে কেন এমনটা ঘটে বারে বারে! কেন যা অনভিপ্রেত তা অনিবার্য হয়ে ওঠে? কথাগুলি এই প্রতিবেদকের নয়। বেহালা অনুকার নাট্যগোষ্ঠীর সম্পাদক তাঁদের সাম্প্রতিক নাটক 'শিষ্য উপাখ্যান' প্রসঙ্গে কথাগুলি বলেছেন।

সুভাষ সেনগুপ্ত রচিত ও নির্দেশিত 'শিষ্য উপাখ্যান' নাট্যকার- নির্দেশকের দীর্ঘদিন নাট্যজগতের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতার ফসল। ব্যক্তিগত জীবনে কিংবদন্তী নাট্যকার শচীন সেনগুপ্তের পৌত্র

অনুকার-এর শিষ্য উপাখ্যান

এবং দীপেন্দ্র সেনগুপ্তের ভ্রাতুষ্পুত্র সুভাষ সেনগুপ্তের লেখালেখি দীর্ঘদিনের। তাঁর 'খবরে প্রকাশ' একসময় নাট্যমোদীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সাম্প্রতিককালের 'অশ্বমেধ'ও বিষয় বৈচিত্র্যে অসাধারণ। 'শিষ্য উপাখ্যান' নাটকের পরতে-পরতে আছে এক নাট্যগোষ্ঠীর তিল তিল করে গড়ে ওঠা। নাট্যম নাট্যগোষ্ঠী তাদের নাট্যকার- নির্দেশক ইন্দ্রকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে নাট্যজগতে স্থান করে নেয়। গ্রুপের একটা কার্যকরী সমিতি থাকলেও নাটক লেখা, নাটক গড়া, তার অর্থসংস্থান, নির্দেশনা সবই ইন্দ্র ঠিক করে। দলনায়কের প্রতি এই নির্ভরতা, বিশ্বাসও কিন্তু একসময় ভেঙে পড়ে যখন একটার পর একটা নাটক দর্শক আনুকূল্য না পায়! দর্শক আনুকূল্য পেতে যে ভাবে নাটককে সাজাতে হয়, ভোগবাদী সমাজের মানুষ— বাজার অর্থনীতির আবহাওয়ায় চটজলদি বিনোদনের খোঁজে যখন টিকিটঘরে লম্বা লাইন দেয় তখন গ্রুপথিয়েটারের দীর্ঘ পরম্পরা, সামাজিক দায়বদ্ধতা কি টিকে থাকবে? দর্শক যে সস্তা বিনোদন চায় নাট্যকার কি তাই সাজিয়ে দেবে দর্শকদের— নাকি দর্শকদের রুচি, বিশ্বাস, সামাজিক সচেতনতা গড়ে তুলবে নাট্যকার। নীলদর্পণ, নবান্ন থেকে চাকভাঙা মধু, দানসাগর, অমিতাক্ষর তো আমাদের সেই পরম্পরা, সমাজ সচেতনতারই ফসল। নাট্যকার-নির্দেশক ইন্দ্রর এই বিশ্বাস— অন্যরা মানতে পারে না। তারা চায় চটজলদি জনপ্রিয়তা, দর্শক আনুকূল্য ইত্যাদি। স্বভাবতই গ্রুপটা ভেঙে যায়। সদস্যরা ছড়িয়ে পড়ে এদিক-ওদিক। তবু ইন্দ্র তার বিশ্বাস থেকে নড়ে না। সে বলে, 'রাতের বেলায় যদি সূর্য ওঠে তবে সূর্য হয়েই উঠবে।'

আগাগোড়া নাটকে একটা টান-টান ব্যাপার আছে। সংলাপ, সম্পাদনা, অভিনয় নাটকটিকে শেষপর্যন্ত মনোযোগ সহযোগে দেখতে বাধ্য করে। অভিনয়ে প্রথমেই নাম করতে হয় ইন্দ্রের ভূমিকায় সুমন সেনগুপ্ত ও সব্যর ভূমিকায় রাজা বর্ধনের। অবাক করেছেন ইন্দ্রর সহধর্মিণী ধীরার ভূমিকাভিনেত্রী চন্দনা গুপ্ত। তাঁর সংযত অভিনয়ে মানসিক দৃঢ়তা ও বিশ্বাস সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এছাড়া সুখেন্দু চট্টোপাধ্যায়, তিথি গোস্বামী, অমিতাভ ঘোষাল, অসীম ভাদুড়ি, রাজু খাঁ, মিলন গোস্বামী ও স্বপন রায়চৌধুরীর অভিনয় যথাযথ। এককথায় দলগত অভিনয় নাটকটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছে। এর জন্য নির্দেশক সুভাষ সেনগুপ্তের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। পিনাকী গুহর আলোর কাজ নাটকের মুড অনুযায়ী সুন্দর হয়েছে। সঙ্গীত যথাযথ। মঞ্চ বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে না। তবে ইন্দ্রের অকালে মৃত কন্যার আবৃত্তির সময় মঞ্চ ব্যবহার অনবদ্য। সব মিলিয়ে বেহালা অনুকারের 'শিষ্য উপাখ্যান' এই সময়ের এক উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা।

তথ্যচিত্রে যাত্রার ইতিহাস ও বিবর্তন

বিশেষ প্রতিনিধি।। আমাদের অর্থাৎ বাংলার লোকনাট্যের প্রাচীনতম যাত্রা— যার প্রভাব বাংলার ইতিহাসে প্রোথিত। যাত্রা মানে গমন, চলা— চৈতন্যদেব থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ, মুকুন্দদাস থেকে শান্তিগোপাল— সকলে যাত্রাকে এক উন্নত স্তরে পৌঁছে দিলেও, জনসমাজে সেই যাত্রা 'যাত্রা' হিসেবে কিছুটা অবহেলিত। সেই যাত্রাশিল্পকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে এক ঘণ্টা সময়সীমার তথ্যচিত্রে যাত্রার ইতিহাস, বিবর্তন ও আত্মনিবেদিত তিন প্রখ্যাত যাত্রাশিল্পীর,— পান্না চক্রবর্তী, তপনকুমার ও শান্তিগোপালের কিছু মূল্যবান বক্তব্য উদ্ঘাটন, নামকরণ : 'যাত্রা— হারানো সুর' অবশ্যই একটি সমৃদ্ধ তথ্যচিত্র এবং এর জন্য অবশ্যই প্রশংসা প্রাপ্য পার্থ ভট্টাচার্যের। তাঁর এই প্রচেষ্টা বর্তমান প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আজকের যাত্রায় যে আধুনিকতার ছোঁয়া, তাতে যাত্রার নিজস্ব কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণভাবে মুছে গেছে। আজকের যাত্রা থিয়েটার ও অপেরার মিশ্রিত যান— 'থিয়েট্রো'। সুতরাং, যাত্রা বলতে প্রকৃতপক্ষে কী বোঝায়, তা জানতে এই তথ্যচিত্র আজকের প্রজন্মের কাছে খুবই শিক্ষণীয়। ফোটোগ্রাফি দক্ষ হাতের পরিচায়ক। তথ্যচিত্র নির্মাতা পার্থ ভট্টাচার্য বিগত দু' দশকেরও বেশি সময় ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু টেলিভিশন চ্যানেলের গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করে চলেছেন। এক যুগেরও বেশি সময় দিল্লীতে কাটিয়ে ফিরে এসেছেন এখানে। গত তিন বছর ধরে এই তথ্যচিত্রটি নির্মাণ চলেছে। এক কথায় বলা যায়, এটি গৌরবময় ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ এক অসামান্য দলিল।

শব্দরূপ-৬৪৯ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

১		২	■	৩			
	■	৪			■	■	■
■	৫		■	৬		৭	
■		■	■	■	■		■
■		■	■	■	■		■
৮			৯	■	১০		■
■	■	■	১১			■	১২
১৩				■	১৪		

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. অশুদ্ধি, আত্মীয়ের মৃত্যুর জন্য দেহশুদ্ধি, ৩. দেব প্রতিমার সাজসজ্জা রচনা বা শৃঙ্গার বেশ বিধান, ৪. গুপ্ত প্রণয়াদি কুকর্মের দূত বা মধ্যস্থ ব্যক্তি, ৫ চাকার পাখি, ৬. অলৌকিক দৃষ্টিশক্তি যার সাহায্যে অতীন্দ্রিয় বিষয় দৃষ্টিগোচর হয়, ৮. মহাভারতে উল্লিখিত ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা, ১০. যজ্ঞে নিবেদ্য বস্তু, ১১. বৃহদাকার সর্প বিশেষ, ১৩. শ্বেতপদ্ম, ১৪. কন্দর্প, কামদেব।

উপর-নীচ : ১. ষোড়শ প্রজাপতির অন্যতম ঋষি, ২. পক্ষী বিশেষ (প্রবাদ— জ্যোৎস্না পান করে), ৩. আদিহীন, উৎপত্তিহীন, স্বয়ম্ভু, ৫. বেদজ্ঞানহীন, ৭. শিব, প্রথম দুয়ে চাঁদ, ৯. থেমে থেমে চলা, গজেন্দ্রগমন, ১০. বৃষ, ষাঁড়, ১২. পদ্যময় বেদমন্ত্র বিশেষ।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৪৬
সঠিক উত্তরদাতা
সৈকত দত্ত রায়
শিলচর, অসম

■	দে	ব	ব্র	ত	■	■	প্র
জ	বা	■	■	ড়া	■	■	বী
■	স্ত	■	■	গ	দা	ধ	র
এ	ক	ত	■	■	ন	■	■
■	■	ক্ষ	■	■	ব	গ	লা
সু	ধা	ক	র	■	■	ণ	■
য	■	■	জ	■	■	প	ঞ্জি
মা	■	■	ত	থা	গ	তি	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

❑ ৬৪৯ সংখ্যার সমাধান আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১২ সংখ্যায়।

সংশোধনী : ৩ ডিসেম্বর ১২ সংখ্যায় ৬৪৮ সংখ্যার সমাধান ভুলবশতঃ ২৪ জানুয়ারি, ২০১৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে বলা হয়েছিল। ঐ সমাধানটি আগামী ২৪ ডিসেম্বর ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে
“চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি”—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক— রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আজ রীণা দেবী। *উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।*

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস
ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—
B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T.”
কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।
চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা– (সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।
বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।
দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।
মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ২১

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

থাই-কম্বোডিয়ার অধিকারের লড়াই
সংকটে ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ’ শিখরেশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি।। দুই দেশের নিয়ন্ত্রণাধিকারের টানাপোড়েনে অস্তিত্বের সংকটে থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া সীমান্তের প্রিহা (preah) বিহার শিব মন্দির। আসল নাম শিখরেশ্বর। দীর্ঘদিন ধরেই মন্দিরটি বিতর্কিত হয়ে আছে। চলছে অধিকারের লড়াই। ২০০৮ সাল থেকে দু-দেশের যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছে প্রায় পনেরোরও বেশি সেনার। ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি’ সমস্যা সমাধানের জন্য দু-দেশের সঙ্গেই বৈঠকে বসে। কিন্তু দু-পক্ষই মন্দিরটি তাদের বলে জোরালো দাবি জানায়। ফলে এখনও পর্যন্ত মেলেনি কোনও সমাধান সূত্র।

১৯৬২ সালে আন্তর্জাতিক আদালত মন্দিরটি কম্বোডিয়ার বলে একটি রায় ঘোষণা করে। কিন্তু থাইল্যান্ড এই রায়কে নস্যাৎ করে দেয়। তাছাড়া ভূমি আইনের কিছু অসুবিধা থাকায় মন্দিরের পার্শ্ববর্তী কিছু জমিও অমিমাংসিত থেকে যায়। এরপর ২০০৮ সালে ইউনেসকো (UNESCO) শিখরেশ্বরকে ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ’ বলে ঘোষণা করে। এবং কম্বোডিয়াকে মন্দির নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়। আর তাতেই দুই দেশের সংঘাত চূড়ান্ত আকার নেয়। ‘ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কমিটি’-কে আমল না দিয়ে মন্দিরের উপর হামলা চালায় থাইল্যান্ডের সেনা। চারশো রাউন্ডের বেশি গোলা নিক্ষেপ করে। এতে ধসে পড়ে মন্দিরের কিছু অংশ। দুই দেশের অনড় অবস্থানে এখনও অনিশ্চিত হয়ে আছে শিখরেশ্বরের ভবিষ্যৎ।

কম্বোডিয়ার রাজধানী ফেনম পেন (Phnom Penh) থেকে ৪১৪ কিমি দূরে ডেংগ্রেক পর্বতের চূড়ায় এই প্রিহা বিহার শিব মন্দির। ৬২৪ মিটার উঁচুতে এই মন্দিরটি কৈলাশেরই অনুরূপ। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে এটি নির্মিত হয়। কম্বোডিয়ার হিন্দু রাজা জয়বর্মনের পুত্র ইন্দ্রায়ুধবর্মন মন্দিরটি নির্মাণের কাজ শুরু করেন। এবং সম্রাট সূর্যবর্মনের শাসনকালে তা সমাপ্ত হয়। বারশো বছরের পুরোনো এই স্থাপত্য প্রশংসার দাবি রাখে। মন্দিরের ভিতরের গর্ভগৃহে পাঁচটি গোপুরম আছে। এবং দেওয়ালে বিভিন্ন ভাবে নৃত্যরত শিবের মূর্তি ছাড়াও রাম, কৃষ্ণ, সীতা, বিষ্ণু, কালী সহ বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তিও খোদাই করা আছে। সিঁড়ির ২২৫০টি ধাপ পেরিয়ে তবে মন্দিরে ঢুকতে হয়। সিঁড়িটি অবশ্য পরবর্তীকালে ইউনেসকোর অর্থে নির্মিত হয়। এছাড়াও আরেকটি রাস্তা আছে যেটা বর্তমানে থাইল্যান্ডের অধীনে।

থাইল্যান্ড এবং কম্বোডিয়া দুটি বৌদ্ধ প্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও হাজার বছর ধরে বুদ্ধ ও শিব পাশাপাশি শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজিত হয়ে আসছে। এর প্রভাব পড়েছে জাতীয় জীবনেও। দীর্ঘদিনের কম্যুনিস্ট শাসন থাকলেও কম্বোডিয়ার জাতীয় পতাকায় রয়েছে এই মন্দিরের ছাপ। যেমন ভারতের অশোক চক্র। সেখানকার জাতীয় নৃত্যের নাম অপ্সরা। ভাষার ক্ষেত্রেও প্রচুর সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। তবে সবচেয়ে অত্যাশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, দুটি বৌদ্ধ প্রধান দেশ পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে একটি হিন্দু শিব মন্দিরকে কেন্দ্র করে। তবে বিদেশের মাটিতে ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন এই হিন্দু মন্দিরকে নিয়ে চাপান উতোর চললেও ভারত কিন্তু বরাবরই নীরব। বিজেপির রাজ্যসভার সদস্য তরুণ বিজয় সম্প্রতি ওই মন্দির দর্শনে গিয়েছিলেন। এবং মন্দিরের সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করতে কম্বোডিয়ার রাজধানী ফেনম পেন এবং ব্যাংকক সফর করেন। সেখানকার রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও দেখা করে খুব শীঘ্রই মন্দির নিয়ে দু-দেশের এই সমস্যা সমাধান করার অনুরোধ জানান। দাবি জানান মন্দিরের সংরক্ষণ নিয়েও। ভারতেও তিনি এ বিষয়ে সরব হন। বিদেশমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করে মন্দিরের বিষয়ে সবিস্তারে জানান। তবে এখনও পর্যন্ত ভারতের পক্ষ থেকে কোনও হেলদোল লক্ষ্য করা যায়নি।

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
10 December - 2012

FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®

দাম : ৭.০০ টাকা